হাসান আজিজুল হক

জীবন ঘষে আগুন

জীবন ঘষে আগুন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

২০/৬/৮৫

জীবন ঘষে আগুন

হাসান আজিজুল হক

মুক্তধারা

মুক্তধারা ৯৪৯

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১
বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৮৫
প্রচ্ছদ-শিল্পী : কালাম মাহমুদ
মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১
বাংলাদেশ
মূল্য : সাদা : ২৫.০০ টাকা
লেখক কাগজ : ১৮.০০ টাকা
স্বত্ব : শামসুন্নাহার হক

JIBAN GHASHE AGUN
[Short Stories]
By Hasan Azizul Huq
Cover Design : Kalam Mahmud
Second Edition : June 1985
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj, Dakha-1
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 25.00
Lekhokprint : Taka 18.00

অগ্রজা জাহানারা বেগমকে

হুমায়ুন কবীর

লেখকের অন্যান্য বই

সমুদ্রের স্বপ্ন : শীতের অরণ্য

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

এই সংকলনভুক্ত সব কটি গল্পই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। মাঝখানের গল্পটি 'আততায়ী আঁধার' নামে 'ছোটগল্প'-এ বেরিয়েছিলো। গল্পটির নাম বদলে 'খাঁচা' রাখা হলো।

হা. আ. হ.

শোণিত সেতু	৯
খাঁচা	৩৬
জীবন ঘষে আগুন	৫১

শোণিত সেতু

গাঁয়ের পূর্বদিকের ঢালুতে গত তিনদিন থেকে একটা ভীষণ কাণ্ড চলেছে। দুটি ষাঁড় লড়াইয়ে নেমেছে। যোদ্ধা দুটির একটির রং ধবধবে শাদা, কালো চুলঅলা চামরের মতো পরিচ্ছন্ন লম্বা লেজ, উঁচু খাড়া কুকুদ। এটি বিরাট আকারের, ঘাড়ের দিকটা সরু, পাগুলোও তাই, কুচকুচে কালো দুই চোখ। নিবাস এই গ্রামেই। আর একটি বিদেশী—কোথা থেকে এসেছে ঠিক বলা যাচ্ছেনা—ধোঁয়াটে রং, বেঁটেখাটো শক্ত বাঁধুনি, ছোট ছোট পা, ভীষণ মোটা গর্দান, চোখের রং ধোঁয়াটে, ছাই ছাই, নিচে কাজল পরানো। ভুরুর নিচে তিন চারটে করে বলিরেখা। দেখেই মনে হয় বদমেজাজী আর কুচুটে স্বভাবের। প্রায় সকলেই এই রকম মত দিয়েছে যে লড়াইটা বাধিয়েছে ঐ বাঁটকুলটা। এ গাঁয়ের শাদা ষাঁড়টা নাকি ভারি লক্ষ্মী! ষাঁড় হলেও। ব্যাপারটার শুরু এইভাবে।

ভোরের দিকে বেড়া ভাঙার মত মড় মড় শব্দে মালেক মোড়লের ঘুম ভেঙে গেল। প্রায় তখুনি সে ধরে নেয় যে বেগুনগাছগুলো শেষ হয়ে গেছে এবং শেষ করে গেছে শাদা ষাঁড়টাই। ধর্মের ষাঁড় বলে কেউ তাকে কিছু বলে না। তাছাড়া বিবেচনা করে দেখলে সে অতি শিষ্ট ও ভদ্রস্বভাবেরও বটে। তবে গোজন্ম টিঁকিয়ে রাখতে গেলে খাদ্যগ্রহণও তো করতে হয়। মালেক মোড়ল হুড়কো হাতে বেরিয়ে গেল। হুড়কো নেওয়া হয়েছিল ওটাকে ভয় দেখানোর জন্যে—পেটানোর জন্যে নয়। এমন আদুরে স্বভাব ওর যে কিল চড় ঘুষি যাই চলুক না কেন ইচ্ছে হলে দাঁড়িয়ে থাকবে কিংবা বসেই থাকবে বা যা খাচ্ছিল খেয়েই যাবে। মালেকের যাওয়াটা বৃথা হোল—সমস্ত ক্ষেতটিকে বিধ্বস্ত করে চটকে বেড়া উপড়ে ফেলে দিয়ে সে তখন বড়ো মাঠাম গাছটায় শিং চুলকোচ্ছিল, হুড়কো হাতে মালেককে আসতে দেখে ষাঁড়েন্দ্রগমনে

পূবদিকের খামারে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। মালেক ফিরে আসছিল আর একটু গড়িয়ে নেবার জন্যে, এই সময়ে মেঘরঙা বীরটিকে পগারের ঢালু গায়ে দেখা গেল। মালেক খুবই অবাক হয়ে গেল—কারণ ইতিপূর্বে কখনো সে দেখেনি ষাঁড়টিকে এবং তার গলায় দড়ি দেখে সহজেই অনুমান করে নিতে পারল যে অন্য কোথাও থেকে সে আবির্ভূত হয়েছে। এরপরেই যা ঘটল সেটার জন্যে মালেক ঠিক তৈরী ছিল না। এগাঁয়ের শাদা ষাঁড়টি যেন প্রাতঃব্যায়ামের জন্যেই হালকা মেজাজে এবং নিঃশংকচিত্তে কয়েকটা লাফ দিয়ে ঝোপের বাইরে চলে এলো। এবং সোজা পরদেশীটির মুখোমুখি। একটু হকচকিয়ে গেল শাদাটা—কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে সে সম্রাটোচিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে চেয়ে চেয়ে পরখ করতে লাগল। ছাই রংয়েরটা একবার তাকালো মাত্র—তারপরই আস্তো গোঁয়ারের মতো ঘাড় নামালো। মালেক বলল, এই রে! বলে হুড়কো বাগিয়ে ধরল।

বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল একেবারে সকাল বেলাতেই সমরে প্রবৃত্ত হতে এগাঁয়ের রাজাধিরাজের একটুও ইচ্ছে ছিল না। সে পিছিয়ে এসে একবার অবজ্ঞার সঙ্গে বহিরাগত বর্বরটির দিকে চেয়ে স্থানত্যাগের উপক্রম করল। ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল ছাই রংয়েরটি, তার মোটা ঘাড় আরো মোটা হয়ে এলো যেহেতু সে মাথা প্রায় মাটিতে নামিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থাতেই পেট খালি করে আরো একবার গর্জে উঠল সে, তারপর মাথা তুলে লেজ খাড়া করে শত্রুর পিছনে পিছনে চলতে শুরু করল। শাদা ষাঁড়টি (তাকে মানিক নামে ডাকা হয়) একবারো ফিরে তাকালো না পশ্চাদ্ধাবনরত বৈরীর (ধরা যাক তার নাম অবলাকান্ত, যদিও নামটা ঠিক মানানসই হোল না—তবে অর্থবহ নিশ্চয়ই) দিকে। অবলা ফুট পাঁচেক ব্যবধান রেখে চলতেই থাকে এবং এইভাবেই ওরা রাস্তায় এসে হাজির হয়। হঠাৎ, একেবারে আকস্মিকভাবে এইবার মানিক, সম্ভবত অত্যন্ত উপদ্রুত এবং বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরেই অবলাকান্তের পাঁজরায় এমন সাংঘাতিক একটা গুঁতো দিল আর তেমনি করেই ওকে এমনভাবে ঠেলতে শুরু করল যে অবলার নেহাৎ চারটে পা ছিল —না হলে অত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হোত না। মানিক তাকে ঠেলতে ঠেলতে পগারের দিকে—ঢালু জমিটার উপরের দিকে নিয়ে চলল। মালেক দেখল নতুন ষাঁড়টার কুকুদের ঠিক নিচে গোল কালচে রংয়ের ফুটো থেকে টকটকে লাল রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে। সে হুড়কো নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল এবং এই সর্বপ্রথম মানিক ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার দিকে তাকালো মাত্র। মালেক তার চোখে কি দেখলো

সেই-ই জানে ; সেখানেই হুড়কো ফেলে একটি দৌড়ে নিজের ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। এবং বাড়ির ভিতরে চলে গেল। এরা ইতিমধ্যে পরস্পরকে ছেড়ে দিয়েছে, সরে গেছে একজন পগারের উত্তর দিকে আর একজন দক্ষিণ দিকে আর দুজনেই নরম মাটিতে খুর আঁচড়াচ্ছে। কালো রংয়ের ঝুরঝুরে মাটি ছিটকে উঠছে চারিদিকে। মানিক ঘাড় নামিয়ে তৈরী হোল, তার বিশাল দেহ ফুলে উঠল, লেজ উঁচু হয়ে গেল, সুন্দর আকারের কুচকুচে কালো শিং দুটির উপর সূর্যের আলো পড়ল। ছাই রংএর অবলার ঘাড়ে ভাঁজ পড়ল অসংখ্য—বলশালী মহীরুহের গুঁড়ির মতো দেখাতে লাগল তার ঘাড়। এরপরেই ওদের শিংগুলি খটাখট শব্দে আটকে গেল। দুজনেরই মাথা নামানো—নাক প্রায় মাটিতে—জোর নিঃশ্বাসের বাতাসে আশে-পাশের ঘাস কাঁপছে। অবলাকান্তের চোখের উপরের বলিরেখা সংখ্যায় আরো বেশী হয়ে গেল।

লড়াই শুরু হলো।

ডাক্তারের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিশানাথ এমনিতেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজন সম্ভবত তাতে স্বস্তি পাচ্ছিল না। কারণ নিশানাথের হাঁপানি হয়েছে আজ বিশ বছর—নানারকম গ্রাম্য টোটকা আর বারদুয়েক গ্রামের হাতুড়ে বরকতকে দিয়ে পরীক্ষা করনো ছাড়া তার এই কালরোগের কোন চিকিৎসাই হয়নি। ত্রিসীমানাতেও দেখা যায়নি কাউকে। নিশানাথ যেন প্রকৃতপক্ষেই আত্মীয় বান্ধবহীন! কিন্তু আসলে তাতো নয়, প্রচুর আত্মীয় তার। আজ সবাই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রচণ্ড জেদ—নিশানাথ কোন অবস্থাতেই বিনা ডাক্তারে মরতে পারবে না। মরাটা যখন নিশ্চিত, তখন ডাক্তারকেও আসতে হবে।

পাশের গাঁয়ের পাশ করা ডাক্তার নিশানাথের মরার তদারক করতে এলো। সে একটা চ্যাটাইয়ে শুয়েছিল—একটা চ্যাটাই মাত্র ; কাঁথা তার কোনকালে ছিল না একথা সত্যি নয়, সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এমনভাবে যে সেটাকে আর কিছুতেই ব্যবহার করা যায়নি। একই মায়ের পেটের একটি চমৎকার ভাই ছিল নিশানাথের সামান্য একটু দোষ ছিল তার। বউকে বড্ডো পিটোত। আর কাঁচা পয়সা যা পেত মদ গাঁজা ভাঙ খেয়ে ফুঁকে দিত। ভাইটিকে বড্ডো ভালোবাসতো সে। অদ্ভুত

ব্যাপার এই ঃ এজন্যে মার খেত নিশানাথের বউ। নিশানাথ ভাইকে ভালোবাসবে আর মার খাবে নিশানাথেরই বউ—এটা বেচারার কাছে প্রথম দিকে বিশ্রী বদনিয়ম বলে মনে হোত। কারণ ভাইটা সব উড়িয়ে দিচ্ছে অথচ তার বিরাট সংসারটিকে টানতে হচ্ছে নিশানাথকেই একথাটা বলায় দোষের কি আছে বোকা বউটা কোনদিন বুঝতে পারল না। যাই হোক, ভাইটি জমিজমা যা ভাগে পায় বিক্রী করে এদেশ থেকে চলে গেছে এজন্যে নিশানাথের প্রচণ্ড দুঃখ হলেও সে ব্যাপারটাই শেষ হয়ে গেছে।

এটা অবশ্যই খুবই হাস্যকর যে নিশানাথ পেশায় কবিরাজ ছিল। সে মরে যাবার পরও লোকে তাকে কবিরাজ নিশানাথ বলেই ডাকবে তাতেও সন্দেহ নেই। সমস্ত জীবনটা সে গাছগাছড়া, লতাপাতা এই সব নিয়ে কাটিয়ে দিল—পদ্মমধু, অনুপান, চ্যবনপ্রাশ, খল—ইত্যাদি কথা লেগেই থাকত তার মুখে। তবু কেউ কোনদিন জিগগেস পর্যন্ত করেনি নিশানাথ নিজের বিশ বছরের পুরনো হাঁপানিটার কোন ব্যবস্থা করতে পারল না কেন। এমন কি গত বছর শীতকালে যখন তার মায়ের সজ্ঞান স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটল তখনো নিশানাথ কোনরকম ওষুধ দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি কেন তাও কেউ তাকে জিগগেস করবে না। অর্থাৎ নিশানাথ কবিরাজ হয়ে জন্মেছে এবং কবিরাজ হিশাবেই মারা যাবে। শুধু মাঝখান থেকে হাঁপানিটা তাকে না ধরলে সে আরো অনেক কিছু করতে পারতো। অন্তত পুরো দুগণ্ডা সন্তানের জনক হওয়া তার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ছিল না—কারণ তার বউ এখনো চল্লিশ পার হয়নি।

এসমস্ত কথাই অবশ্য এখন অর্থহীন। নিশানাথ তো মারা যাবেই। তাতে তার বিশেষ আপত্তি বা দুঃখ রয়েছে এমন মনে হয় না। নানারকম রোগহরণ ওষুধ বানাতে বসে মাঝে মাঝে সে একটা অদ্ভুত কথা বলতো তার বউকে, ভাবিস, শুধু ধন্বন্তরিই বানাই আমি। আরো এট্টা জিনিশ শিহিছি আমি বুঝলি! সেডাও ধন্বন্তরি—দুফোটা পেটে পড়লিই ভবনদীপার। ভারি আগ্রহ তার বউয়ের, আমাকে দিওনা দুফোঁটা! দেবা না?

মাইরি আর কি—নিশানাথ বিষ বিষ গলায় বলে, এমনি ছাড়া পাবি ভাবিচিস না? পেডে যেগুলো ধরিছিস ওগুলো বড়ো হবে, ও শালার আগাছার ঝাড়, না খাতি দিলেও বড়ো হবে, আগুনেও পোড়বে না—জলেও ডোববে না—বড়ো হয়ে তোকে নাতি মারবে, ঝাঁটা মারবে—তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে, চুলের মুটি ধরে ঘুরোপে—তবে তো ভোগান্তি শেষ হবে। তার আগেই পালাতে চাস? ধন্বন্তরিডা আমার থাকল।

বউয়েরও হাসির ধার বেরোয় যেন হিস হিস করে, কি স্বার্থপর। সবতা সুখ একাই চাও। মন্তর প'ড়ছি আর পেড়ে এসেছে ওরা, না! লোক নেই, জুতোয়ে দাঁত ভাঙ্গে দেতো।

যা যা, ভাগ এখান থে। নিশানাথ হাঁকিয়ে দেয় বউকে।

যাই হোক আসল ব্যাপারটা হোল নিশানাথের সম্ভবত মরতে বিশেষ আপত্তি নেই। যদিও একথা সত্যি যে মরতে সেই বিশেষ ধন্বন্তরির সাহায্য সে নেয়নি, এমনিতেই মারা যাচ্ছিল। পুরনো হাঁপানিতে। দৃশ্যটিকে চিত্তাকর্ষক বলতেই হয়। এমনিতে এসব গাঁয়ে জনবসতি কম। একবাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব অনেক। কাজেই হাটবাজার ছাড়া লোকজন একসঙ্গে হয়ই না প্রায়। এজন্যে নিশানাথের বাড়িতে এই ভিড়টাকে বড্ডো জীবন্ত লাগছে। জায়গাটা যেন গমগমে হয়ে উঠেছে। মানুষের নিঃশ্বাস এমনিতে গরম --নিশানাথের বিছানার চারপাশে জমায়েৎ মানুষের আবার এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা উত্তেজনাও আছে। মানুষ কিভাবে আস্তে আস্তে মারা যায়—অর্থাৎ কবিদের ভাষায় মৃত্যুর কোলে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে—তা দেখতে উত্তেজনা স্বাভাবিক। একেবারে সামনে থেকে মানুষের মরণ দেখার সুযোগ কি ছাড়ে কেউ? নানারকম মারী মড়কে, ভয়ংকর রোগের ধাক্কায় মানুষ মরে পট করে—বিশেষ কিছু জানান না দিয়েই। নিশানাথই শুধু মৃত্যুকে ডেকে এনে বসিয়ে রেখেছে বুকের উপর। লোকজন তাই আসছে যাচ্ছে যেন জিগগেসই করে ফেলবে, কই কতদূর এগুলো? নিশানাথের চার নম্বর ছেলেটা বাপের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাবলা ন্যাবলা চেহারা ছেলেটার। কালো রং, ধুলো মেখে মেখে ধুলোটে মেরে গেছে। নাক দিয়ে অনবরত সর্দি গড়াচ্ছে--গালের উপর শুকিয়ে অভ্রের পাতের মতো চকচক করছে। একটা প্যান্ট অবিশ্যি পরেছে—কিন্তু এইটুকু ছেলের লজ্জা নিবারণের এমন কিছু দায় নেই এই ধরণের ভাব করে প্যান্টটা হাঁ করে আছে। ছেলেটা বাপের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা চুষছে আপন মনে।

কিছুক্ষণ আগে গোটাদুই ইন্‌জেকশন করে আর খানকতক বড়ি আনবার পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার আট টাকা পকেটে ফেলে চলে গেছে। নিশান্নাথের খুড়তুত ভাই বলল, সব বাজে—দাদার যে মালিশডা আছে না—সেই যে দাদা যেডা বরাবর বুকে দিতো সেইডা লাগাও। আরাম হয়ে যাবেনে।

নিশানাথের বুক হাঁপরের মতো উঠছে আর নামছে। এই রকম করতে গিয়ে তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। কারণ নিয়মিত তালে বুকটাকে ঐভাবে ওঠানো নামানো সহজ কথা নয়। মালিশ দেবার জন্যে বুকে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে

নিশার চোখদুটো বেরিয়ে এলো। কিন্তু মালিশ চলতে থাকেই। নিশানাথকে ঘিরে যেমন ভিড় তাতে বাইরে থেকে তাকে আর দেখা যায় না। তার মেজো পুত্রটি তখন বাড়ি ফিরছিল। বাপ সম্বন্ধে বেচারির বেশী মাথাব্যাথা নেই। সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল তার—দুতিন দিন থেকে নিশানাথের বউও তাদের ছাই গিলগে—মরগে, বাপের আগে যা—এই ধরণের বাজে কথা চালাচ্ছিল। এজন্য কিছু মেটে আলু জোগাড় করেছিল ছেলেটা—নিজের পেট তো ভরিয়েছেই, বোধহয় উদ্বৃত্ত খানিকটা নিয়েও এসেছে ভাইবোনদের জন্যে। ছেঁড়া গামছায় কিছু বেঁধে আর আধখাওয়া একটা আলু হাতে সে নিঃশঙ্ক মনে বাড়ি ঢুকছিল, এই সময় বাজের মতো ছোঁ মেরে দারোগালি তার ঘাড়ে পড়ল, হারামজাদা পিচেস, আলু তুললি কেন বল। হারামজাদা, পরের হারাম খাও। ছেলেটা ভয় পেয়ে ছুটে ভিড়ের মাঝখানে আসতে চায়, দারোগালি তাকে আসতে দিল না। ধরে বারকতক ঝাঁকি দিতেই গামছা থেকে আলুগুলো মাটিতে পড়ল। ঘটনাটা সহৃদয় কোন দর্শকের মনে নিদারুণ আঘাত দিল মনে হয়—সে চিৎকার করে অন্যান্যদের দলে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। তার কথাটা হচ্ছে ঃ এমন নির্দয় মানুষ সে কখনো দেখেনি। একটা লোক মরে যাচ্ছে। সে কাজটি নির্বিঘ্নে সমাধা করতে পারলে একটি মেয়েমানুষ বিধবা হবে। ছটি অবোধ বালক পিতৃহারা হয়ে যাবে। তাছাড়া মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে নানাঝামেলায় থাকে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না। সেজন্য মরার সময়েও কি মানুষ একটু শান্তি আশা করতে পারে না? দেখা গেল, যে এইসব প্রশ্ন তুলল তার সমর্থক জুটতে দেরি হোল না। সবাই দারোগালিকে তাড়না শুরু করে। এমন নির্দয় কঠিনহৃদয় মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? মেটে আলু অবশ্যি এখন সবাই ভাতের বদলেই খাচ্ছে। তা নাহলে ওতো কচু ঘেঁচুর মতোই বাঁদর শুয়োরের খাবার। দারোগালি স্পষ্টত বিব্রত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে নিশানাথের বউ যখন আলুগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে ছোঁড়াটাকে ঘাকতক বসিয়ে ফোঁস ফোঁস করে কান্না জুড়ে দিল, তখন দারোগালি রীতিমতো আপশোষ করতেই লাগল। তবে মেটে আলুর লোকসানটা বড্ডো গায়ে বেজেছিল তার। সে তো আসলে বস্তুটির প্রতি লোভবশত নয় প্রয়োজনের কথাটাই মনে করে অন্ধ হয়েছিল। হিতাহিত জ্ঞানটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। নিশানাথ এসব কথা বুঝতেই পারল না—ক্ষুধাতৃপ্তির মতো সামান্য পার্থিব ব্যাপারে মনোনিবেশের অবস্হা ছিল না তার। সে প্রাণপণে নিঃশ্বাস নেওয়া এবং ফেলাতেই মগ্ন হয়ে থাকল। কিন্তু লৌকিক

কাণ্ডগুলি চলতেই থাকে। খুড়তুত ভাইটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাদার অবর্তমানে পারিবারটির কি দশা হবে বর্ণনা করে যায়।

এই সময় নিশানাথ হঠাৎ যুদ্ধ চালাতে ব্যর্থ হয়। হেঁচকির মতো আওয়াজ বের করে। কিছুক্ষণ সবাই দারোগালির দিকে মন দিয়েছিল—আবার তাদের মনে নিশানাথ রাজত্ব চালাতে লাগল। লোকটাকে তখন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। কাঁচাপাকা দাড়ি অনেকদিন কাটা হয়নি, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঁচু হয়ে গেছে—যেন বেরিয়ে আসতে চায়। ঘোলাটে চোখদুটি কপালের বাইরে চলে এসেছে, দুটি শুকনো সরু বাঁশের মতো ঠ্যাং চ্যাটাই ছাড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কোমর থেকে ওপরটা খালি—কোঁচকানো চামড়ার নিচে পাঁজরের হাড়গুলি জির জির করছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। একটা নীল রঙের বড়ো মাছি মুখের অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঢুকবে কি ঢুকবে না যেন মনস্থির করতে পারছে না।

এইবার হয়ে আসতিছে—ঘন ভুরুর ভিতর থেকে খুদে খুদে দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে খাদেম মন্তব্য করল।

হাসপাতালে একবার নিয়ে যাবার চিষ্টা করলি হয় না—কথাটা কে যে বলল ঠিক বোঝা গেল না।

হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল কেউ। মনে হোল ছ্যা ছ্যা করে উঠল যেন। এমন হাসি যে প্রস্তাবকারী লজ্জায় ঢুব করে ভিড়ের মধ্যে ডুব দিল। নিশানাথ কিন্তু খুব শক্ত এবং ঘাগী লড়ুয়ে। ঘোঁৎ করে শব্দ করে কি যে সে তার বুকের ভিতর থেকে সরিয়ে ফেলে সেই জানে—কিন্তু একঘেয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজে আবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালু হয়ে যায়।

তখুনি খবরটা আসে। সাত্তার মোড়লই আনল। এমনিতে হয়তো জরুরি নয় খবরটা। একটা ষাঁড়ের সঙ্গে আরেকটা ষাঁড় মারামারি চালাবে এতো খুবই শাদা কথা। সব সময়েই যে সংঘর্ষের কারণ থাকতে হবে তাও নয়। বিনা কারণেও দ্বন্দ্ব চলতে পারে—ষাঁড়েরা এমন করেই থাকে। তবে কিনা মানিকের মতো নিরীহ প্রাণী ওদের খুব বেশী জানা নেই। একটু বেশী প্রেমিক স্বভাবের বটে—প্রেমিকের মত সময়ে সময়ে মারমুখীও, কিন্তু আদতে বড্ডো নরমধাতের জানোয়ার সে। এইরকম মরণপণ লড়াইয়ে নেমে যাবার কি থাকতে পারে তার?

কি যে হয় কেউ বুঝতে পারে না। শান পাথরে ইস্পাৎ ঘষলে যেভাবে আগুন ছিটকে ছিটকে পড়ে সেইভাবে নিশানাথের বিছানার চারিপাশের ভিড় থেকে উত্তেজনা নিষ্কাশিত হতে থাকে। আর গাঁজা ভাঙ মদের মতো উত্তেজনাও

তো একটা নেশা! একটা অদ্ভুত আবেগ এসে তাদের চেপে ধরে। তাদের ষাঁড় মানিকের পক্ষে চলে যায় সবাই। গাঁয়ের ইজ্জতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ব্যাপারটা। তাদের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায় মানিকের জন্যে তারা সমর্থন জড়ো করতে শুরু করেছে। এমন কি নিশানাথের মরণের ব্যাপারটাও পানসে পানসে ঠেকছে তাদের কাছে এরই মধ্যে।

নিশানাথ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না। তবুও নতুন ষাঁড়টা কতো বড়ো—কি রং তার, বেঁটেখাটো কিনা—শক্ত সুন্দর শিং না কপালের উপর ঝুলে থাকা নড়বড়ে শিংঅলা ইত্যাদি খবর জানার আগ্রহ থেকেই অনুমান করা যায় কিভাবে নাড়া খেয়েছে তারা।

নিশানাথের বউ মালিশ করা ভুলে হাঁ করে এইসব কথা শুনছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার মালিশ বন্ধ করতেই নিশানাথের নিশ্বাস সহজ হয়ে গেল। একটু টরটরেও হয়ে এলো যেন। বেশ সহজ হতেই চাইল নিশানাথ। কি জানি কিছু শুনতে বা বুঝতে পারছিল কিনা সে। নিশানাথের বউয়ের খাঁড়ার মতো নাক কেমন জেদী আর একরোখা হয়ে গেল।

মনে হতে পারত লড়াইটা শেষ হয়ে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ থেকে মানিক ও অবলাকান্ত পরস্পর মাথা লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দুজনকেই বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মানিক বারকয়েক নিশ্চয়ই আছাড় খেয়েছে। তার শাদা শরীর ধূলিধূসরিত, ডানদিকের দাবনার খানিকটা ছড়ে গিয়ে লোম উঠে গেছে। কালো চামড়া উঁকি দিচ্ছে সেখানে, তাছাড়াও বুকে তলপেটে চোখের নিচে অবলার শিংএর আঘাতের দাগ। তার কালো রেখা-টানা চোখের তলায় পানি গড়িয়ে পড়ার চিহ্ন। এসব থেকে মনে হতেও পারে যে লড়াইটা একতরফাই হয়েছে, মানিক ক্রমাগত মার খেয়েছে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। খুব আদুরে স্বভাবের সে, গাঁয়ের মানুষের প্রশ্রয় পেয়েছে বরাবর—কষ্টের জীবন ছিল না তার। নিষ্করুণ পরিশ্রম কাকে বলে—নিষ্ঠুর লড়াই কি ধরনের জিনিশ এ সব ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই তার। এজন্য তার বিরাট সুপুষ্ট দেহটি বাবু বাবু গোছের দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কষ্টের আর পরিশ্রমের কাজে নামতেই তাই তার চাকচিক্যটুকু খুব তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়েছিল। যতটা ঠ্যাঙানি খেয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল আসলে অতটা বেকায়দায় সে পড়েনি। কারণ, তার ষাঁড়-জন্মের জন্যে সাংঘাতিক দৈহিক শক্তি

এবং অকুতোভয় স্বভাবটি তো সে ঠিকই পেয়েছিল। অবলার আবার ব্যাপার আলাদা—তার শরীরে এতটুকু বিদেশী রক্ত ছিল না। সে দেহাতি গোছের—কোন গৃহস্থের সম্পত্তি। ঠ্যাঙানি পিটুনী তার দৈনন্দিন বরাদ্দ। এইসব কারণে অবলাকে এই যুদ্ধে খুব ব্যতিব্যস্ত বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু মার কি সে কম খেয়েছে? তার কতকগুলি সুবিধা আছে বটে—যেমন শরীরটা ছোট, গোলগাল—মানিকের মতো সুদৃশ্য লম্বাটে নয়। সে গোলগাল, কিন্তু মেদবহুল নয়—ইস্পাতের মতো কঠিন মাংসপেশী দিয়ে তৈরী তার শরীর। এছাড়া তার পাগুলি খাটো—মাটিতে কোনরকমে গেড়ে দিতে পারলে লোহার খুঁটির মতো অনড় হয়ে আটকে যায়। তখন তাকে নড়ানো সাধ্য নয় মানিকের পক্ষে। মানিকের শক্তি অনেক বেশি—কিন্তু তার শক্তি কেমন ছড়িয়ে আছে। অবলার প্রকাণ্ড মোটা ঘাড়—ফুলে ওঠা উচ্ছ্রিত বুক—সমস্ত শক্তি যেন সেখানে জড়ো হয়েছে। অবলার এমন কি শিংএর সুবিধেটাও বেশি। কিন্তু এত সুবিধে নিয়েও অবলা মার খেয়েছে। মানিকের বিরাট রাজকীয় শরীরটারই তো আলাদা একটা মূল্য আছে। সে যখন পিছু হটে তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে অবলাকে ধাক্কা দেয়—অবলা শত চেষ্টা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের একবার মনে হোল লড়াইটা বোধ হয় শেষ হয়েই গেল। ওরা দুজন মাথায় মাথায় লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এমন স্থির হয়ে যে মানিকের পিঠের উপর একটা মাছি বসলে সে চামড়া কাঁপিয়ে সেটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করল—সেটা পর্যন্ত দেখা গেল। একটু সময়ের জন্যে মনে হওয়া সম্ভব ছিল যে ওদুটি জীবন্ত ষাঁড় নয়—পাথরের তৈরী। তবে তাদের চোখ অস্বাভাবিক লাল হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাসও পড়ছিল জোরে জোরে। এই অবস্থাটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না। অবলাই অকস্মাৎ ঘটাল এটা। তখনই বোঝা গেল যুদ্ধের শেষ তো নয়ই, হয়তো বা শুরুই হয়নি এখনো। অবলা শিংএ শিং লাগিয়ে ঘাড়টা নাড়ালো একবার। তাতে এমন ভীতিকর একটা শব্দ বেরুলো যে মনে হোল চামড়া ঢাকা মানিকের ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেল কট করে। সে ভারি অসহায়ভাবে ঘাড়টা কাৎ করল। অবলা অবস্থাটার সুযোগ নিয়ে আরো চাপ দিয়ে মানিকের লম্বাটে ঘাড়টাকে মাটিতে প্রায় মিশিয়ে ফেলল। মানিকের উঁচু ককুদ থেকে শুরু করে বুক পর্যন্ত কোণাকুণি ভাঁজ পড়ে গেল। সামনের একটা পা একটু বেঁকেও গেল। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হোল তাকে। শ্বাসকষ্ট হলে যেমন হয়। চোখের লালরঙে মারমুখী ভাবটা চলে গিয়ে একটা অসহনীয় কষ্টের

ভাব ফুটে উঠল। অবলা আর একটু চাপ দিলে তাকে নুয়ে পড়তে হবে এই সময় কি নৈপুণ্য সে ব্যবহার করে সেই-ই জানে—কিন্তু তাদের শিংগুলি খটাখট বেজে ওঠে আর মানিকের ঘাড় সোজা হয়ে যায়। তখন বুঝতে পারা যায় ষাঁড়ের ঘাড় বস্তুটি বড়ো সোজা নয় এবং অবলার সঙ্গে যে লড়ছে সেও একটা ষাঁড়। প্রীতিবশত আতংকিত হওয়া চলে—কিন্তু সত্যি করেই ভয়ের কিছু নয়। মানিক এখন আর ঐভাবে থাকতে রাজী নয়—কি কারণে আবার তার অবলাকে পিটুনি দেবার ইচ্ছে দেখা দিয়েছে। সে পিছেয়ে এলো। বোধহয় অভিজ্ঞতায় জেনেছে এই কায়দাতেই সে সুবিধে পাচ্ছে বেশি—দুর্দম বেগে সে অবলার উপর পড়ে। অবলা তার ছোট ছোট পা মাটিতে গেড়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘাড়টা আবার একটু কাৎ করে সে মানিককে গ্রহণ করে। কিন্তু এবার সামলানো সম্ভব হোল না তার পক্ষে। পিছনের পা দুটিকে কোন রকমে খাড়া রাখে বটে কিন্তু শরীরের সামনের দিকটা যেন চুরমার হয়ে ভেঙে যায়। অধঃপতিত অবলাকে এখন পরম আনন্দে ঠ্যাঙাতে থাকে মানিক। একটার পর একটা নিষ্ঠুর আঘাত চলে—মাংসের উপর শিংএর প্রহারের শব্দ হয় না তেমন—তবু যে চাপা থ্যাপথ্যাপে একটা আওয়াজ ওঠে সেটাকে বড্ডো অস্বস্তিকর মনে হয়। অবশ্য মানিকের পায়েরও একটা শব্দ ওঠে মাটি থেকে, অবলা যে উঠতে চেষ্টা করছিল তারও একটা আওয়াজ আছে—কিন্তু মাঝে মাঝে শব্দহীন মুহূর্তও আসছিল। তখুনি অস্বস্তি লাগছিল বেশী। যারা দেখছিল তাদেরও বিশ্রী লাগছিল ব্যাপারটা যদিও মানিকের এই কৃতিত্বে একটু একটু গর্বও যে হচ্ছিল না এমন নয়। তবু এ অবস্থাটাও বেশিক্ষণ থাকেনা। এক হিশেবে ধরতে গেলে লড়াই শুরু হবার পর প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হচ্ছিল, কোন দুটি মুহূর্তই তো আর একরকম থাকতে পারে না, মানিকের লেজ নড়ছিল তো অবলার পিছনের একটা পা মাটিতে ঘষে যাচ্ছিল। ওরা দুজনেই উঠে পড়ল। অবলা এড়িয়ে চলার তালে ছিল মনে হয়—সামান্য বিশ্রাম চাচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে উঠেই মানিকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লেজটা তুলে একটু যেন ঔদাসীন্যের ভাব করে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু মানিক তাকে এখন ছেড়ে দিতে চায় না—সে পিছন থেকে কাছে গিয়ে তলপেটের দিকে শিং লাগিয়ে তাকে আড়াআড়িভাবে ঠেলতে ঠেলতে ঢালু বেয়ে নিচের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু সে অবস্থারও শেষ আছে—অবলা আবার ফিরে দাঁড়ায়। সামান্য সময়ের জন্যে দুজন পরস্পর থেকে একটু দূরে যায়। এখন খুব স্পষ্ট দেখা যায় তাদের। ছাইরংয়ের গাঁট্টাগোট্টা গুণ্ডা অবলা—বল্লমের মতো সিধে শিং, বেঁটে লেজ আর পা—

নিচু, ঝুলেপড়া কুকুদ, বিশাল চওড়া বুক কিন্তু তার চাইতেও যেন একটু মোটা-পেট,চওড়া খুর। তার বুকের কাছেসকালের প্রথম আঘাতের ঘা-টি এখন শুকিয়ে কালচে হয়ে এসেছে। কিন্তু তার চোখের নিচের ক্ষত থেকে রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে। ছাইরংটা আরো বিবর্ণ দেখাচ্ছে—বারকতক ভূমি-শয্যা নিতে হয়েছে তো! মানিক—বিরাট, ছিপছিপে—এখন কিছুটা গর্বিত। কিন্তু তার উপর দিয়েও ধকল গেছে। সমস্ত শরীরে ধুলো—পাছার কাছে সবুজ রং—ঘাস পিষে লেপে গেছে।

অবলা ঘুরে দাঁড়ালো। দুজনের খুলিতে খুলিতে লেগে শানে বেল ফাটার মতো আওয়াজ বেরুল। অবলা নিয়ে আসছে মানিককে—উপরের দিকে—সে পালকের মতো যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আসছে। তার কোন ওজনই নেই মনে হয়। মাটি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—ভেঙে ধুলো হয়ে যাচ্ছে।অবলা আরো ছোট হয়ে গেছে। একটা বেঢপ পুঁটলির মতো। একে তো তার ঘাড় ছোট—তা আবার সামনের দুপায়ের মধ্যে দিয়ে পেটের দিকে চলে যেতে চায়। সব মিলিয়ে অবলাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে বড্ডো। চার পা কাছাকাছি, লেজ সামান্য তোলো। মানিক এসে দর্শকের কাছাকাছি এসে তবে একটু সামলাতে পারল। ঠেলা-ঠেলির কাজটা এতক্ষণ সেই বেশী চালাচ্ছিল—লাভও হচ্ছিল তার।কিন্তু দেখা গেল প্রয়োজনে অবলা বিস্ময়কর শক্তি দেখিয়ে দিতে পারে। শিংএর ব্যবহারে সে এমনিতেই নিপুণ, অত্যন্ত চতুর ও দ্রুত যেজন্যে মানিককে ঠ্যাঙানি দিতে পারছিল বেশি—তার শক্তির খানিকটা পূরণ করতে পেরেছিল। কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষেপে গেলে তার পেশীর শক্তিও যথেষ্ট কাজে আসে। মানিক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল।

লড়াইয়ের এইসব খুঁটিনাটি লোকেরা আস্তে আস্তে আবিস্কার করতে লাগল। তাছাড়া তারা ষাঁড় চেনে। মানিকের ধরনের ষাঁড় যে দেখতে সুন্দর, স্বভাবে শান্ত হয়ে থাকে এও তাদের জানা। এমন কি মানিকের জন্যে যদি গ্রামের সমস্ত গরু তার মতোই হয়ে যায় তাতেও তারা খুশি। বলতে কি তাকে আদর দিয়ে টিঁকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যও তাই। মানিক যে অত্যন্ত বলশালী তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার রং, সরু সরু পা, ছোটখাটো চমৎকার পরিষ্কার খুর ইত্যাদি তার আয়েশি প্রকৃতির কথাই বলে। অন্যদিকে অবলার কদাকার হাভাতে চেহারা—বিশ্রী ময়লা রং, সুষমা-হীন আকার, ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া খুর তার অত্যন্ত রুঠোমেজাজ আর দুঃসাহসী স্বভাবেরই ইঙ্গিত দেয়। মার দিতে দিতেই অবলা ক্লান্ত হয়ে গেল। দুজনে মুখোমুখি হয়ে খানিকটা সরে দাঁড়াল। যারা দেখছিল তাদের নিঃশ্বাস

বন্ধ হয়ে এলো। এবার কি হতে পারে? কি করবে ওরা এরপর? সরে না গিয়ে আর কি লড়াই চালানো সম্ভব? দেখা গেল দুজনেই খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। ধুলো ছিটকে এসে লোকজনের চোখে এসে লাগতে লাগল। মানিক চোখ লাল করে একবার দর্শকদের দেখে নিল। এমন ভয়ংকর চাউনি যে সবাই ভাবল মানিক এবার তাদেরকেই আক্রমণ করবে। অবলা মাথা ঘাড় দেহ কাঁপিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে নিল। একটা ভোঁতা গর্জনও করে নিল সঙ্গে সঙ্গে। মানিক রাগের চোটে দিশাহারা হয়ে হঠাৎ শিং দিয়ে খানিকটা ভিজে ভিজে কালো মাটি তুলে চারদিকে ছিটিয়ে দিল। এইসব পাঁয়তারা শেষ হয়ে আবার লড়াই শুরু হতে দেরি হলো না।

জিনিশটা ধুঁইয়ে উঠছিল।

ঝগড়াঝাঁটি, খুনজখম বা ঐধরনের লোমহর্ষক কাণ্ড কেউ পছন্দ না করলেও কখনো কখনো জড়িয়ে কি পড়তে হয় না? মান সম্মানের জন্যে হোক, স্বার্থরক্ষার জন্যে হোক মারামারি কাটাকাটি তো করেই মানুষ। কিন্তু তা নয়। দীর্ঘ একটা বছরের তীব্র ক্ষুধার মুখোমুখি হবার সাহস কজনের থাকে? মান-সম্মান ইজ্জৎ চুলোয় যাক—মামুলি স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন নয়—একেবারে নিশ্চিত ক্ষুধার সামানে দাঁড়িয়ে কে স্থির থাকবে? হঠাৎ সেই পরিস্থিতির সামনেই পড়ে গেল গাঁয়ের সমস্ত মানুষ। ঘটনাটি চেপে বসল তাদের উপর। এবার তাদের একটা বিলের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে শহরের একজন ব্যবসায়ী। এই লোকটিকে অনেকে চোখেও দেখেনি। যারা দেখেছে তারাও ঠিক মনে করতে পারে না কি করম তার চেহারা—কেমন বেশবাস। আরো অদ্ভুত, শত চেষ্টা করেও কেউ তার সঙ্গে কোনরকম শত্রুতার কথা মনে করতে পারে না। ব্যক্তিগত শত্রুতার তো কথাই ওঠে না—সে থাকে শহরে গাড়িঘোড়া, লোকজন এইসব নিয়ে অন্যজগতে। সে যেভাবে জীবনযাপন করে, যে জামাকাপড় ব্যবহার করে বা যে খাদ্য সে খায় তা তাদের কল্পনাতেও আসে না। কাজেই শত্রুতার প্রশ্নই নেই এখানে। সমস্ত গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে শত্রুতাও কেউ মনে করতে পারে না। তবে এটুকু শোনা গেছে সে মাঝে মাঝে মেয়েমানুষের খোঁজে এদিকে আসে। কখন নাকি একবার তাকে পিটিয়েও দিয়েছিল কোন নীতিবাগিশ যুবক। কিন্তু এ ব্যাপারটি এমন ধরনের যে এটাকে নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ বাঁধানোর মতো মূর্খ নয় ব্যবসায়ীটি। যাই হোক, ব্যাপারটা হচ্ছে

এই যে ঐ প্রায় অপরিচিত ব্যক্তিটিই লোকজন পাঠিয়ে চাষীদের একটা বিলের ধান কেটে নিয়ে যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই কাজটির যুক্তি খুঁজে বের করতে গাঁয়ের লোকরা হিমশিম খেয়ে যায়। তারা খুব হৈ চৈ করে। কিছুই বুঝতে পারে না। শেষে একজন কৃষক নেতা প্রচণ্ড বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে এর কারণ আর কিছুই না, ব্যবসায়ীটি শত্রুতা চান না, তিনি ধান চান। ধান বিক্রী করতে পারলে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হবে। এই কথা শুনে সবাই হাসাহাসি শুরু করে। তারা বুঝতেই পারে না—টাকাই হোক আর সোনাই হোক আর জহরতই হোক—অন্যের ধান চাওয়াটা কি ধরনের আবদার। বহু কষ্টে তাদের বোঝানো হোল ব্যাপারটা। এজন্যে নেতাটিকে অনেক আঁকজোঁক কষরৎ করে চাষীরা কিভাবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শোষিত হয় তার বিবরণ দিতে হোল। সে সব কথা লোকজন বোধহয় শুনলই না ভালো করে। তবে তাদের ধান যে কেটে নিয়ে যাওয়া হবে ন্যায় বা বিবেক ইত্যাদির ধার না ধেরে—সেটা আস্তে আস্তে কবুল করে তারা।

কিন্তু একটা কথা। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী লোকটির এইরকম আহ্লাদী ধরনের কাজের কোন ফিকিরই ছিল না? অবশ্যই ছিল। সে নাকি লোনাপানি থেকে বিল বাঁচানোর জন্যে যে বাঁধ দেওয়া হয় গত বছর সেটির চুক্তি নিয়েছিল জলবিদ্যুৎ বিভাগের কাছ থেকে। বাঁধটি ঐ বিভাগেরই কাজ—কিন্তু অনেক সময় এধরনের চুক্তি করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীটি যেহেতু এই বাঁধ দিয়েছে, কাজেই আগামী চারবছর পর্যন্ত ফসলের দুআনা অংশ তার প্রাপ্য। বক্তব্যটি বেশ যুক্তিসিদ্ধ—হঠাৎ এমনো মনে হতে পারে যে অভাব অনটনে চাষীদের এমনিই অধঃপতন হয়েছে যে তারা লোকের ন্যায্য পাওনা পর্যন্ত দিতে চায় না। ব্যবসায়ীটির একটি মাত্র অপরাধ—তার টাকা আছে এবং এই টাকার অংশ আরো খানিকটা বাড়ানোর জন্যে সে বাঁধ দিয়ে চাষীদের বাঁচিয়েছে। টাকা থাকলে টাকা নিয়ে প্রত্যেকেই খেলা করতে চায়। এইভাবে জিনিশটা উপস্থিত করলে কিছুই বলার থাকে না—শুধু একটিমাত্র কথা থেকে যায়। তাহলে, গতবছর বাঁধটা চাষীরা নিজেরাই দিয়েছে। জলবিদ্যুৎ বিভাগের কাছে দীর্ঘদিন আবেদন নিবেদন কাঁদাকাটি ইত্যাদির পর যখন কিছুতেই উক্ত বিভাগের ঔদাসীন্য ভেদ করা গেল না—তখন এই বাঁধ চাষীদের নিজেদেরই দিয়ে নিতে হয়েছে। এজন্যে ব্যবসায়ীটির অছিলা শোনার পর থেকে তারা বিস্ময় রাখার জায়গা পাচ্ছে না।

এই জগাখিচুরি কাণ্ডটার শুরু বেশ কিছুদিন আগে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম-দিকে বিশ্বাস হয়নি। তারপর লোকজন বোকা বনে যেতে লাগল। শেষে এমন তালগোল পাকিয়ে গেল যে কিভাবে এই অত্যাচারের প্রতিকার হতে পারে সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারলনা। কেউ কেউ ঠ্যাঙানি দেবার পক্ষে ছিল। ঝামেলা এড়িয়ে কোনরকমে ধান কেটে ঘরে তোলার পক্ষে ছিল কিছু লোক। মোট কথা ঘোঁট পাকিয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। কারো কারো এমন রাগ হোল যে ব্যবসায়ীটিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার কথা বলতে লাগল। কিন্তু সে কাজটি কোনরকমেই সম্ভব ছিল না—কারণ সে নিজে এখানে হয়তো কোনকালেই আসবে না। সে যাই হোক, আসলে মানুষ যে ঠিক কি ধাতু দিয়ে তৈরী সেটা ঠিক করা ভারি দুষ্কর। এটা কি রকম অদ্ভুত ব্যাপার যে প্রথমে যে দাবীটাকে অত্যন্ত আবদার বলে মনে হচ্ছিলো—অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর বলে গুরুত্ব পর্যন্ত দিচ্ছিলো না গাঁয়ের মানুষ—সেই দাবীটাই আস্তে আস্তে তাদের মনে ঢুকে যায় শুধু নয়, একসময় ওটার জন্যে তারা খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেয় এবং সবচাইতে মর্মান্তিক এই যে অসহায়ভাবে এটার কাছে নতিস্বীকারের অবমাননা ও প্রায় মেনে নেয়। কৃষক নেতাটির কাজ শুরু হয় ঠিক এই জায়গা থেকে। সে ওদের ভয় দেখাতে থাকে। আর সে কি যে সে ভয়! শহরের ব্যবসায়ীটি ধান কেটে নিয়ে যাবার পর সামনের বছরটিতে ক্ষুধা কিভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার এমন বিস্তৃত বর্ণনা দেয় যে শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। এবং একবার অধিকার ফস্কে গেলে প্রত্যেক বছরেই যে একই ঘটনা চলতে থাকবে তাও তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তখুনি সামনের জনতার ভিতর থেকে কেউ—বোধ হয় হানিফ বিশ্বাস—বলে ওঠে, আল্লায় এ্যার বিচার করবে। হানিফের চিবুকে ছোট ছোট দাড়ি—কটা রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে—চোখের চাউনিটা বোকা বোকা—সে এ অঞ্চলের নামকরা চোর এজন্যে তার কথা শোনবার গরজ ছিল না কারো। বিশেষ করে আল্লার বিচার করার ব্যাপারটা তার মুখে ভারি অদ্ভুত। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লার প্রসংগই এমন যে প্রায় প্রত্যেকে সে বিষয়ে খোলাখুলি মতামত দিতে থাকে। নেতাটি প্রমাদ গণে—তার মুখ থমথমে হয়ে যায়। তারপরেই তার ভুরুর নিচে অসম্ভব চতুর চোখ দুটি নেচে ওঠে, নিশ্চয়ই, আল্লার হাতে তো সবই—তাতে সন্দেহ কি! কিন্তু তিনিই তো বলেছেন, আল্লা শুধু তাকেই সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে। কাজেই আমরা বসে থাকলে আল্লাও বসে থাকবে আর সমস্ত বিলের ধান গিয়ে উঠবে সরদার সাহেবের গোলায়। খুব নম্র

বিনয়ী আর গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলার চেষ্টা করে মানুষটি—কিন্তু কিভাবে চাপা বিদ্রূপের ভাবটা এসে শেষের কথাগুলিতে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। পুরুষানুক্রমে শোষিত হতে হতেও যারা ভবিতব্য এবং অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করে বা ঈশ্বরের কাছে বিচার চায়—তাতে যার যা সুবিধাই হোক কৃষক কর্মী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে বিচিত্র কি!

প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। হতে পারে কেউ তেমন উৎসাহ পেল না। নেতার বক্তৃতাটিও হয়তো যথেষ্ট জোরালো হয়েছিল। সামনে পুরো একটা বছরের খাদ্য—যেটা এখন মাঠে ছড়িয়ে আছে—জোর করে, বিনা যুক্তিতে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে যে অবস্থাটা দাঁড়াবে সেটা বুঝতে খানিকটা দেরি হলেও চাষীরা কিছুতেই বুঝবে না তাতো আর হতে পারে না। এবং বুঝতে পারলে আল্লার উপরে সবকিছু ছেড়ে না দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষ আল্লার উপরে ভরসা রেখেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এইকথা যুক্তিশাস্ত্রে হয়তো নেই—ক্ষুধার্ত মানুষের ইতিহাসে নিশ্চয়ই আছে। নেতার বোধহয় এইরকম আস্থা ছিল বলেই সে ক্ষান্ত দেয়নি। দেখা গেল লোকজন বেশ ঘন হয়ে এলো। যারা দাঁড়িয়েছিল তারা মাটির উপরেই বসে পড়ল। গামছা কোমরে বেঁধে নিল কেউ কেউ। যাকে বলে রীতিমতো সভা—কি করতি হবে তাই কও—অধৈর্য হয়েই একটা ছোকরা চিৎকার করে বলল। নেতা সেকথায় কান না দিয়ে কথা চালাতেই লাগল। হয়তো এটাও তার অনেক কৌশলের একটি—সে জানে কিভাবে জনতাকে তৈরী করে আনতে হয়। সে সেই অস্থির শ্রোতাদের উপরই দীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে যায়! একজন হঠাৎ পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে এইবার তুমি নামো দিনি—কি করতে হবে সেই কথাডা কও।

কি করতে হবে তা কি আবার কয়ে দিতে হবে? যে ধান কাটতে আসবে তার গলাডা কুপয়ে ধড়ের থে নামায়ে ফেলতি হবে। ঠিক যেন আগুন ধরে গেল। বারুদের মতো জ্বলে উঠল মানুষ। নেতা তখন বৃথা চেঁচাচ্ছে, তোমার ধান অন্যে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে—তুমি কি করবে জানো না? চোখের সামনে থেকে তোমাদের বৌ মেয়েকে কেউ ধরে নিয়ে গেলে কি করবে তোমরা? আমি বক্তৃতা দিতে না আসা পর্যন্ত বসে থাকবে নাকি? এই ধরনের গা জ্বলানো বক্তৃতা সে কেন করেছিল বোঝা খুবই দুষ্কর। তবে উপস্থিত রুক্ষ কদাকার চেহারার লোকগুলো এমন সাংঘাতিক গর্জন শুরু করলো যে নেতার ক্ষীণ শহুরে গলা আর শোনা গেল না।

এই ঘটনাটি ঘটল বিকেলে। মানিক ও অবলা তখনো পুরোদমে লড়ছে।

সারাদিনে তারা ক্লান্ত হলো না তার কি একমাত্র কারণ তারা ষাঁড়? না কি অন্য রহস্য কিছু আছে?

পরের দিনের ঘটনা কিন্তু বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। বিস্ফোরণোন্মুখও বলা যেতে পারে। সমস্ত গ্রামে আগুন লেগে যায়নি—সর্বধ্বংসী কোন প্লাবনও আসেনি—এরকম কোন সর্বনাশ তো দূরের কথা নেহাৎ ব্যক্তিগত কোন বিপদও আসেনি কারো—দুটি নির্বোধ বলশালী প্রাণীর সংঘর্ষ কি কারণে সমস্ত গ্রামকে টানছে হঠাৎ সেটা বোঝা যায় না। প্রাণীদুটির কাছে যাবার কোন উপায় নেই এখন। দুজনের কাউকেই ঠিকমতো চেনা যায় না। ছিঁড়েখুঁড়ে কেটেকুটে ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত হয়ে গেছে দুজনেই। মানিকের পেট গিয়েছে খারাপ হয়ে। দাবনার কাছে ময়লা আবর্জনা মাখা। তার চামরের মতো সুন্দর লেজের কেশগুচ্ছ ধুলোকাদায় দলা পাকানো—পাগুলো হলদেটে হয়ে এসেছে। শাদা শাদা লোম উঠে গেছে বহু জায়গায়, দগদগে ঘা দেখা দিয়েছে। মোট কথা প্রাণান্তকর সংঘর্ষের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। অবলার অবস্থা বোধহয় আরো খারাপ। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে তার। গর্তের মুখগুলোয় কালো রক্ত জমে আছে। হয়তো তার সামনের কোন পায়ে আঘাত লেগে থাকবে—ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না বেচারা। ল্যাংচাতে হচ্ছে। ঘাড়ের কাছেও একদিকে ফুলে উঠেছে। তার চেহারা এমনিতেই কদাকার—কিন্তু এখন তার চেহোরা এমন দাঁড়িয়েছে যে তাকে কোন্ ধরনের প্রাণী বোঝাই দায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে যদিও এটা একটা সার্বক্ষণিক বৈরীতার প্রশ্ন এবং কাউকে রেয়াৎ করার কথাই নেই তবু বোধহয় একটা চুক্তি আছে ওদের মধ্যে। যেমন এই লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকেই কিছু ঘাস পাতা চিবিয়ে নেওয়া। একটু দূরে সরে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা। সে সময়ে মনে হয় পরস্পরের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা আছে তাদের কিন্তু তারপরেই আবার যখন নির্দয় আঘাত চলতে থাকে তখন মনে হয় দুটির একটি খতম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটার নিস্পত্তি নেই।

গোটা ঘটনাটির পুরো আকর্ষণ কি এখানেই তাই মনে হয়। দুটি প্রাণ বা দুটি শক্তিই তো দ্বন্দ্বে নেমেছে। সে সম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নেই। **এই সংগ্রামেই কি জীবনের সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে না? হয়তো**

গাঁয়ের মানুষের কাছে এই কথাটা পরিষ্কার নয়। কিভাবেই বা তা হবে? তারা তো এটাকে স্রেফ দু'টি ষাঁড়ের মজাদার লড়াই হিসেবেই নিয়েছে। কিন্তু আমৃত্যু সংগ্রামের নিজস্ব জোর তো আছেই। সেই জন্যেই লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনে জনসমাগম অনেক বেশি। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম [illegible]কে ঠিকই করছে। মাঠের কাজ এখনো শুরু হয়নি। তবু পাড়াগাঁয়ের লোকের কাজের কি শেষ আছে? হয়তো বাড়ির পাশের ক্ষেতটির উপর দুঘন্টা কোদাল চালাতে হোল। গরুগুলির দুধ দুইয়ে ফেলতে হবে। তারপর সে দুধ বাজারে নিয়ে যাওয়া আছে। অল্পস্বল্প কেনাকাটার কাজ আছে। বাড়িতে তৈরী লাউ কুমড়ো বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রীর ব্যাপার আছে। নিজের নিজের গরুবাছুরের তদারক আছে। এছাড়া জ্বালানি কাঠ জোগাড়, খাবার পানি সংগ্রহ, সম্ভব হলে কিছু মাছটাছের খোঁজে থাকা—এই রকম অসংখ্য কাজে গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সব সময়েই মৌমাছির মতো ব্যস্ত। যারা দিনমজুর খাটে তাদের তো কথাই নেই—ভোরে ক্ষেতে বেরিয়ে যেতে হয়। মোট কথা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামটা হয়তো চোখে দেখতে পাওয়া যায় না সব সময়ে—কিন্তু চলছে তো প্রতিমুহূর্তেই। কখনো তীব্র হয়ে ওঠে—কখনো বা নিশানাথের সংসারের মতো ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলে। এইদিক থেকে দেখলে বাস্তবিক অবাক হয়েই যেতে হয়। সকাল থেকে ঘানি চালিয়ে যে তেল সংগ্রহ করছে—যে হাঁড়ি বানিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা—এমন কি যে বাড়িতে শিশুরা খিদে হজম করছে নির্বিকার মুখে—তাদের সকলের মধ্যেই তো লড়াইটা এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। তবু অবসর থেকেই যায়—খেলাধুলো, গানবাজনা, আমোদ ফূর্তি বা প্রেমের জন্যেও। অদ্ভুত কান্ড তো বটেই। এবং হয়তো বা শুধু মানুষেরই কান্ড। অত্যন্ত কদর্য জীবনের শর্তের মধ্যেই আশাহীন না হয়ে কাজ করে যাওয়া।

প্রায় প্রত্যেকেই নিজের অবসর কাজে লাগাচ্ছে। আমোদ প্রমোদের বিকল্প হিসেবে। অন্তত গতকাল পর্যন্ত তাই ছিল। দুটি ষাঁড়ের লড়াই দেখে চমৎকার কেটে যাচ্ছিল সময়। গাঁয়ের দিকে উত্তেজনার বিশেষ কিছু থাকে না। মাঝে মাঝে যাত্রাগান বা ঐ জাতীয় কিছু হলে সবাই ফূর্তি করার সুযোগ পায়। কিন্তু সে আর কদিন। কাজেই মানিক অবলার যুদ্ধ তাদের উত্তেজনার দাবী মেটাচ্ছিল খানিকটা। আজ সকাল থেকেই কেমন যেন একটু অন্যরকম হয়ে উঠল ব্যাপারটা। দর্শক হিসেবে হাজির থাকাটা যেন কিছুটা কর্তব্যের অঙ্গ হয়ে গেল। এমনকি উপস্থিত থাকতে না পারলে কৃপাকটাক্ষ পর্যন্ত সইতে হচ্ছিল তাদের। তাতে অবশ্য কাজকর্ম ফেলে

যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাজির হচ্ছিল না সবাই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বা কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে দর্শকদের দলে গিয়ে মিশছিল লোকজন। দুএকজন যাদের বিশেষ ব্যস্ততা নেই তারা তো সর্বক্ষণের দর্শক। যুদ্ধটার নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল এই দলের লোক। শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে গেল যে মানিক অবলা একা একা যুদ্ধ প্রায় করতেই পেল না। কেউ না কেউ সব সময়েই থাকছে। দিন যতো এগিয়ে যেতে লাগল অনেক মানুষই একসঙ্গে হাজির হতে শুরু হোল। শেষে দেখা গেল গ্রামটাই—অর্থাৎ সমস্ত গ্রামের মনোযোগটাই উঠে এসেছে এখানে। তাদের সমস্ত প্রসঙ্গ এবং সমস্যাসহ।

আর একটি কথা। গতকাল গাঁয়ের লোকের উত্তেজনাটা ছিল ভাসা ভাসা ধরনের। মানিক এই লড়াইয়ে জিতে যাক মোটামুটি এটাই ছিল তাদের কামনা। সে যখন অবলার কাছে প্রচণ্ড পিটুনী খাচ্ছিল, তাদের ভারি ক্ষোভ আর আক্রোশ হচ্ছিল। এমনকি এক সময় মানিকের যখন অসহায় অবস্থা তখন তারা লাঠি ঠ্যাঙ্গা নিয়ে অবলাকে খেদিয়ে দেবার কথা ভাবতেও লজ্জিত হয়নি। একই কারণে অবলা ঠ্যাঙ্গানি খেলে তারা পুলকিত হয়েও উঠছিল। কিন্তু আজ তাদের দেখে মনে হচ্ছিল লড়াইটিকে মেনে নিয়েছে তারা—অহেতুক উত্তেজিত হতে তারা চাইছেনা। এই মারামারিতে একটা ষাঁড় মারা পড়বে এও তারা ধরে নিয়েছে। একটা ভারি ও ব্যাপক উত্তেজনা থমথম করতে লাগল লোকজনের মধ্যে। রাত্তিরে শালারা কি করিছে? ঘুমোয়নি নাহি এট্টু?

এটা একটা প্রশ্ন বটে। দুচার মিনিট ঘুমিয়ে নেবার প্রয়োজন কি তাদের হয়নি? সে সময় কি তারা লড়াই থেকে বিরত ছিল? নাকি মাথায় মাথায় লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে নিয়েছে তারা?

কেডা দেখতি গেছে—ঘুমোয়ছে না গুঁতোগুঁতি করিছে। খলিল উত্তর না চাইলেও খাদেম জবাব দিয়ে দেয়। ষাঁড় আর মানুষ কি এক নাহি?

লড়াইটা তীব্র হয়ে উঠল বিকেলে। দুপুরে দুজনেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। একবার সরেই গিয়েছিল দুজনে দুদিকে। অনেকে ভাবল হয়তো শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা এখানেই। আপোষেই শেষ করে গেল তারা লড়াইটা। মানিক খানিকটা দূরে গিয়ে মুখ উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল। তারপর বেশ শান্তভাবেই ঘাস খেতে শুরু করে দিল। অবলা তো চোখের আড়ালেই চলে গেল। কিন্তু এই অবস্থাটা বেশিক্ষণ থাকল না। মানিক একটু পরে ঘাস খাওয়া বাদ দিয়ে অবলাকে খুঁজে নিয়ে এলো। বিকেলের দিকে অসহ্য

কাণ্ড আরম্ভ হোল। একটি দুটি করে অসংখ্য লোক জড়ো হলো। পাশের গাঁ থেকেও দুচারজন এসে গিয়েছিল। পশ্চিমের বিলের ধান নাকি কেটে নে যাচ্ছে—তারা জিগগেস করল। হ—সেই রহমই তো শুনতিছি—খাদেম জবাব দেয়। তার ক্ষুদে হিংস্র চোখ থেকে ধারালো চাউনি ঝিক ঝিক করে ওঠে। আসলে এ আলোচনায় যাবার কোন ইচ্ছে নেই তার। বিশেষ করে অন্য গাঁয়ের লোকের কাছে। বিশ্রি একটা অবিশ্বাস নিয়ে সে জবাব দেয়। তার কটা রঙ আর লালচে চুল থেকেই বোঝা যায় খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ সে।

তা তোমরা কি করবা ঠিক করিছ? ওরা আবার জিগগেস করল।

আমাদের কিছুই করা লাগতিছে না—আল্লায় এ্যার বিচের করবে। আল্লার কাছে মাপ নাই—চোর হানিফই বলে এই কথা, আল্লা তো সব দেখতিছে। না কি কও?

সে তো ঠিকই—তবু তো কিছু করতি হবে।

খাদেম অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল বলে কিছু বলল না।

দ্যাহো, আল্লায় মারলি কেউ রাখতি পারে না, হানিফ বলে, তার রোগা লম্বাটে ঘোড়ার মতো মুখ—হলদে ফ্যাকাশে রং। খুবই নির্বোধ মনে হয় তাকে। তবু গাঁয়ের লোকে যেভাবে প্রচুর কথা বলে তেমনি অসাড়ভাবে সে কথা বলতে থাকে, আল্লা আমাদের রুজির মালিক—তার ইচ্ছে হলি বাঁচবো, ইচ্ছে না হলি মরবো—ঠিক কতা না?

তুই চুপো—বেশি লম্বা কথা কস না কচ্ছি—খালেক পশুর মতো গর্জে উঠল, তুই কারো জমি ভাগেও করিস না, তোর জমিও নেই এক ছডাক। তোর দালালি কথা শুনলি পিত্তি জ্বলে যায়।

দাড়ি রাখিচিস ক্যানো কদিন—ক তোর দাড়ির মধ্যি কি আছে? এই ঠাট্টাটা করে বসে পরশ। তার বয়েস কম আর একটু ফূর্তিবাজ সে। হাতের কাঁচিটা দিয়ে হানিফের হালকা দাড়িতে নাড়া দিয়ে সে আবার বলে, তোরে কতি হবে কি রহস্য আছে তোর দাড়ির মধ্যি। গত বছর যহন ধরা পড়িলি মোড়লদের বাড়িতি—হায়রে তোর চুল আর দাড়ি ক্যানো কাটে দেলে না?

হানিফের কাছে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না—আল্লার নূর হোল দাড়ি এই কথা বলে প্রতিবাদ সে অবশ্যই করতো—কিন্তু গতবছর মোড়লদের বাড়ি ধরা পড়ার কথাটা এমন মারাত্মক সত্যি যে কোনো কিছুই বলা সম্ভব হোল না তার পক্ষে।

তাতো হোল, তোমরা কি করতিছ তাতো বললে না—পাঁশের গায়ের আবেদ

শেখ পুনরায় জিগগেস করে।

দ্যাহা যাক—কি করা যায়, খাদেম আবার সংক্ষেপে জবাব দেয়।

তোমরা কি খবর নিতি আইছো? ছোকরা বয়েসী কিছু লোক বেরোয় একপাশ থেকে। খবর নিতি আইছো নাহি—এ্যাঁ। আসলে কিন্তু এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মাথাব্যাথা নেই। এরা সত্যি করেই খোঁজখবর নিতে এসেছে কিনা তা তারা জানতে চায় না। তারা হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছিল—কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে আর একদিকে চলে গেল।

খাদেমের গলার পেশী ফুলে ওঠে। ছোট ছোট ক্রুর চোখে পলক পড়ে না, কি খবর? আবেদ শেখের চোখের দিকে চেয়ে সে হেঁকে ওঠে।

অনেক মানুষ একজায়গায় জড়ো হলে সব প্রসঙ্গই পিছলে পিছলে যায়।

ভিড়ের দক্ষিণ দিকে আলোচনা চলে এবারের খেজুর গুড় সম্পর্কে।

পশ্চিমের কোণে এবারের ধান নিয়ে।

ধান এবার যা হয়েছে ভালই বলতি হয়।

ভালো হলি তো হচ্ছে না—ধান তো নে যাবে মালিক।

হ, তোমারে দিয়ে যাবে সব, না?

না, সে কথা হচ্ছে না—

সেইরকম কথাই তো কচ্ছ। মালিকের ধান দেবা না?

আরে, দেব না কচ্ছে কেডা—দিতি হবে তাই বলতিছি।

হঠাৎ সমস্ত কথা এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। ভিড় একাগ্র হয়ে মানিক অবলার লড়াই দেখছিল ঠিকই—কিন্তু যে কোন জিনিশের মতোই তাদের যুদ্ধটাতেও তো উত্থান পতন ছিল। একঘেয়ে মুহূর্তও ছিল। এমনিই স্বভাব মানুষের, এমনিই তার অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ক্ষমতা যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রবল উত্তেজনাও তার ধাতে সহ্য হয়ে যায়। শুধু সহ্য হয়ে যায় নয়—সে বিরক্তি পর্যন্ত বোধ করে। তখন নতুন কিছু, প্রবলতর কিছু না হলে মনে দাগ কাটতে চায় না। মানিক অবলার লড়াইটা এমনিতে যথেষ্ট উত্তেজক ছিল—চিন্তা করে দেখলে উত্তেজনায় হয়তো অসুস্থ বোধ করবে মানুষ, ছিঁড়ে যেতে চাইবে তার স্নায়ু—তবু মানুষ দুচার মিনিটেই অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। মানিক কিংবা অবলা নতুন কোন কেরামতি না দেখাতে পারলে মনোযোগ একান্ত হচ্ছিল না। এইজন্যেই কি এই বিরাট ভিড়ের কথার আর প্রসঙ্গের সংখ্যা ছিল না? ফাঁকে ফাঁকে জীবনের নানাকথার আলোচনা চলছিল? দুর্ভাগ্য এবং সুখ—কষ্ট ও যন্ত্রণা এমন কি প্রেম বা ভালোবাসা, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও আল্লার দোজখ সব প্রসঙ্গই যেন ঘুরে ঘুরে আসছিল।

কিন্তু এই সময় কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে গিয়েছিল, না হলে সবার কথা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে কেন? আর কিছুই নয়— সেই মুহূর্তে ওরা দুজন মানিক ও অবলা নিছক শারীরিক শক্তি পরীক্ষা করে দেখছিল। কোন কলাকৌশল নয়, স্রেফ দুজনের ঘাড়ে কতটা শক্তি ছিল সেটারই পরীক্ষা চলছিল। ফলে তারা দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিল—ঘাড় সিধে রেখেছিল, শিংএর ব্যবহারও বাদ দিয়েছিল। চঞ্চল নড়াচড়াও ছিল না আর। দুজনে মাথায় মাথায় দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অফুরান শক্তি প্রয়োগ করে যাচ্ছিল নিজের নিজের ঘাড়ে। বাইরে থেকে তেমন কিছু মনে হচ্ছিলো না—শক্তি তো আর চোখে দেখা যায় না। ঘটনাটা নিঃশব্দে ঘটছিল। তবু বাহ্যিক লক্ষণ কিছু প্রকাশ পেল বইকি! তাদের চারটে চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কখন যে চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে—বা কান দিয়ে রক্ত ছোটে, দুজনের একজনের ঘাড় মচ করে মচকে যায় কিংবা দুজনেরই শরীর বোমার মতো ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায় এমনি ভেবেই যেন প্রত্যেকেই চুপ করে আছে। সমস্ত ভিড়ের চোখ গিয়ে মল্লদের উপরে পড়ল। ষাঁড় দুটি কোনো ফাঁকে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঠিকই—কিন্তু এরা কি দমবন্ধ হয়ে যাবে প্রচণ্ড উত্তেজনায়। একচুল নড়ল না কেউ। শক্তির ভারসাম্য যেন অংকের নিয়মে রাখল তারা—প্রায় সার্কাসের খেলার মতো বলা যায়—কেউ নড়ল না নিজের জায়গা থেকে। অবলা তো তার বেঁটে বেঁটে পাগুলো মাটিতে প্রায় পুঁতেই নিয়েছিল। মানিকের শরীরটা ছিল সামনের দিকে ঝুঁকে। বোঝাই যায় অবলার কাছে ব্যাপারটা পিছু না হটার—মানিককে হটিয়ে দেবার নয়। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে দুজনে দুদিকে সরে গেল। তখন আবার কথা চলতে লাগল, উরে—কি সাংঘাতিক, মরবে, শালার একটা মরবে।

সোহ্য হয়না আর—চল দেহি, বারোয়ে খেদায়ে দিই...না হয় মারেই ফেলাই একডারে এ্যাহেবারে।

হয়েছে—আর বাহাদুরি করো না। ওদের কাছে যাবে কেডা জানডা খোয়াতি?

চমৎকার নাটকের মতো জমে যায় দৃশ্যটা। একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রতিটি ঘটনাই আগের চাইতে প্রবলতর এবং চিত্তাকর্ষক এজন্যে দর্শকরা আর অন্যদিকে মন দিতে পারে না। ওদের দুজনের প্রতিটি নড়াচড়া, আক্রমণের ভঙ্গি, নৈপুণ্য বা কৌশল—দুজনের দুর্জয় সাহস—এইসব তাদের মুহূর্তে মুহূর্তে চমৎকৃত করে। মৃত্যুকে তাদের বিন্দুমাত্র ভয় নেই তাও পরিষ্কার বুঝতে পারে সবাই। কারণ যে কোন সময় একজন মৃত্যুর ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তাদের কোন কাজের মধ্যেই সে

সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতনতা নেই। কিসের তারা মোকাবিলা করছে তারাই জানে। কিন্তু মোকাবিলা করে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

রুষে ওঠা অন্যান্য শব্দের মধ্যে মচ করে যে আওয়াজটা ওঠে সেটা হয়তো ঠিক শোনা যায় না—কিন্তু মানিকের একটি শিংএর কালো খোলটি নিঃশব্দে উঠে আসে। সেটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আস্তো শিংটির চাইতে খোল ওঠা শিংটা ছোট—প্রথমে ধবধবে শাদা—তারপর রক্ত বেরিয়ে এলো গোলাপী। কোনদিক থেকে রক্ত গড়াতে থাকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না—তবে আস্তে আস্তে পুরো শিংটাই রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় এবং যেন উপছে পড়েই তিনচারটে রেখায় তার চোখের পাশ দিয়ে চোয়াল বেয়ে গলার দিকে নামতে থাকে। রক্তের গাঢ় লাল রঙের সরু সরু নালি শাদা লোমের উপর স্পষ্ট হয়ে বসে যায়। মানিক যেন কিছুই জানতে পারে না—সম্ভবত তার কোনো কিছুতেই যন্ত্রণার ছাপ ধরা পড়ে না। তবে দুর্বলমনা কোন আধবুড়ো চাষী দৃশ্যটাকে সহ্য করতে পারে না। তার নাম রমজান শেখ, কালো লম্বা ছিরিছাঁদহীন কর্কশ চেহারা—খুব কাঠখোট্টা নীরস ধরনের। সে নিজে ভূমিহীন, অতি সামান্য জমি ভাগে করে থাকে, কংকালসার একটি বাছুর ছাড়া গোজাতীয় কোন প্রাণী নেই তার, তবুও অভিভূত হোল সে। মাত্র একবার সে বিলাপ করে ওঠে, মারে ফালালোরে—আর বাঁচপে না আমাদের মানিক। এই বলে লোকটা ভিড়ের মধ্যে কারো তোয়াক্কা না করে কাঁদতে শুরু করে দিল। পুত্রশোক নয়, কিছু নয়—এত লোকের মাঝখানে কাঁদতে যেখানে স্বভাবতই লজ্জা পেয়ে যায় মানুষ—কি ফাঁদে যে আটকে যায়, সে কেঁদে কুলিয়ে উঠতে পারে না। চুপচাপ কেঁদে যাচ্ছিল সে—এমন নীরশ্রু ক্ষুদে রুক্ষ চোখ তার যে খুবই বেমানান লাগছিল জিনিশটা। মানিকের আঘাতটা নিঃসন্দেহে সাংঘাতিক হয়েছিল, দেখা গেল সে মাটিতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। চারটে ঠ্যাংই উপরের দিকে তোলা, ক্ষুরগুলো সামান্য গুটিয়ে গেছে। অবলা যেন তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চায়। আদতেই তখন মানিককে অনেক ছোট দেখা যাচ্ছিল। অবলার এক একটি আঘাতে মানিকের শরীরের অংশবিশেষ মাটি ছেড়ে উঠে আসছিল। গড়াগড়ি দিতে হচ্ছিল তাকে।

এই সমস্ত সময়টায় রমজান কেঁদে চলছিল। অবস্থাটার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অন্যেরাও চুপচাপ বসে থাকল। তারপর মানিক উঠল, বেচারার পা কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। কিন্তু উঠে সে দাঁড়ালই। তখন আধো বিদ্রূপ আধো সমীহের সঙ্গে কার কথা ভেসে এলো, ও রমজান চাচা,

কাঁদতিছ ক্যানো? ওরে তোমার কি হলো?

মানুষগুলোর মুখ কঠিন হয়ে এসেছিল। দাঁতে দাঁতে আটকে গিয়েছিল। মানুষের কথার যোগসূত্র বোঝা দায়—মানুষ কথা দিয়ে কিসের অনুবাদ করে তাও ধরা যায় না—কখনো অনুবাদ করে মনের চিন্তার, কখনো বা বাইরের দৃশ্যপট। তাই নেহায়েতই খাপছাড়াভাবে এই অবস্থায় কেউ গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে যেন রক্ত বের করে ফেলবে গলা ছিঁড়ে, এবার কোন শালা জমিতি আসলি, ধানে হাত দিলি, বাপ বলতি হবে না, জমিতিই মাডি নিতি হবে।

কৃষক কর্মী রাত দশটার দিকে খবর আনে। শহরের ব্যবসায়ীটি লোকজন গুছিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত রাত থাকতে থাকতেই মাঠে এসে হাজির হবে। হাজার হলেও ভাড়াটে লোক—এজন্যে ঝঞ্ঝাট এড়ানোর চেষ্টা কেনই বা তারা করবে না? চাষীরা প্রস্তুত হবার আগেই—অন্তত দৃঢ় প্রতিরোধ ঠিকমত তৈরী করার আগেই যদি কাজ কিছুটা এগিয়ে যায়—বিভ্রান্তিকর একটি পরিস্থিতির মধ্যে কাজ হাসিল করে সরে পড়বার মোটামুটি একটা সুযোগ পেলে, টাকার বিনিময়েও কেনই বা তারা সম্পূর্ণ পরের জন্যে জীবন বাজী ধরতে রাজী হবে? চুপিসাড়ে চোরের মতো আসাটা এইজন্যেই তারা পছন্দ করেছে যদিও দিনের আলোয় ডাকাতে রূপান্তরিত হতে বাধ্যও তারা। তাছাড়া এটাও সবাই জানে যে জমিতে প্রথম পা রাখারও একটি নিজস্ব সুবিধা আছে।

খবরটা চাষীরা শান্ত হয়েই গ্রহণ করল। একটু অবশ্য অবাকও হোল তারা। ধান এখনো ঠিকমতো পেকে ওঠেনি। কোন বিশেষ কারণ না থাকলে আর একটু ধীরে সুস্থেই ধানে হাত দিয়ে থাকে চাষী। কিন্তু ধান কেটে নিয়ে যেতে পারলে যার পুরোটাই লাভ—এবং কিছু কিছু নষ্ট হলেও যার গায়ে বাজে না, তার তো দেরি করা কোনক্রমেই সাজে না।

অনেকে অনেকরকম কথা তোলে। থানার সাহায্য নেবার পরামর্শও দেয় কেউ কেউ। কিন্তু থানা অনেক দূরে এবং কর্মীটি খুব শান্তভাবেই জানায় যে থানায় ব্যবসায়ীটি আগেই খবর দিয়ে রেখেছে এবং সে যে ন্যায্য দাবী আদায় করার জন্যে আসছে একথাটাও বোধ হয় বোঝানো হয়ে গেছে।

কৃষকনেতা ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছে। রোদে পুড়ে রঙটা তামাটে হয়ে গেছে তার। নোংরা মুখে ভারি অপরিচ্ছন্ন দাড়ি গজিয়েছে। গাল

ভেঙে গেছে। কপালের নিচে গর্তের ভিতর থেকে চোখদুটি অস্বাভাবিক জ্বলছে। মোটা সুতীর চাদরটা কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে। চোখের পাতাটা পর্যন্ত না ফেলে সে একদৃষ্টে জনতার দিকে চেয়েছিল। তারা তাকে ভাই বলে ডাকে, শ্রদ্ধাও করে—হয়তো গলে পড়ার মতোই শ্রদ্ধা—তবু যখন নীলচে ইস্পাতের মতো উত্তেজনা স্থির হয়ে আছে জনতার মধ্যে, সেই অসহ ও তীব্র উত্তাপের সামনাসামনি একক কণ্ঠে দীর্ঘ ভৎর্সনা বেমানান তো হবেই। কাজেই কথা প্রায় কিছুই হতে পারল না। এমনকি কাউকেই কিছু বুঝিয়ে দেবারও অবসর পাওয়া গেল না।

এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে কিভাবে একটি পুরো গ্রাম জেগে যেতে পারে। খুবই ধীরে ধীরে—প্রায় অলক্ষ্যে—এমন কি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তার আদান প্রদানটা পর্যন্ত সীমিত করে দিয়ে সমস্বার্থের মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। অথচ কাজটা যে অত্যন্ত জটিল তা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে। বিপজ্জনক যে সেটাতো প্রশ্নের বাইরে। তা মনেই আসে না কারো। জীবন যেতে পারে নয় শুধু—জীবন যাবেই দুচারটে এটা নিশ্চিত জেনেও কাজটা অবশ্যকরণীয় বলেই মানে তারা, বিপজ্জনক হিসেবে নয়। কাজটা জটিল নানা কারণে। প্রথমত প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিকে প্রধানত আত্মরক্ষামূলক হতে হবে—জীবননাশক নয়। করণীয় হচ্ছে ধান কেটে আনা—কেটে নিয়ে প্রায় পালিয়ে আসা। এই কাজটা নির্বিঘ্নে ঘটতে দেবার জন্যেই পাহারা মোতায়েন করা, যাদের দায়িত্ব হবে প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখা। এসবই হোল অবশ্য পরিকল্পনা—সুস্থির চিন্তার ফল—বাস্তবে কি দাঁড়াবে তা বলার শক্তি কারোর নেই।

যাই হোক, অভিজ্ঞ লোকের অভাব কোথাও থাকে না—এক্ষেত্রেও নেই। অতিশয় ঠান্ডামাথা হিসেবে যাদের সুনাম, পরিকল্পনাটা রচনার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হয়েছে। তারা লোক বাছাই আরম্ভ করল, দেখা গেল এইকাজ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই টান পড়ল। মাত্র ঘন্টা দুইয়ের মধ্যেই একটি মাত্র কর্মসূত্রে বাঁধা পড়ে গেল প্রায় সকলেই—জড়িয়ে পড়ল বলা যেতে পারে। যুবকদের মধ্যে সামান্য দুচারজন বাদে প্রায় সকলকেই ধান কেটে নেবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া ঠিক হোল। কারণ খাটুনে কৃষাণ হিসেবে এরাই সব চাইতে দক্ষ। কিন্তু সড়কি ও বল্লম চালানোর কাজটা বিশেষ দক্ষতাসাপেক্ষ, অভিজ্ঞতাই সেখানে বড়ো কথা। কাজেই হয়তো এমন দাঁড়ালো যে যারা প্রতিরক্ষায় থাকবে তাদের অধিকাংশই প্রৌঢ় এবং শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। তাদের কাছাকাছি থেকে যন্ত্রপাতি যুগিয়ে

দেবার জন্যেও কিছু বিশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী মানুষ রাখতে হোল। এইভাবে প্রায় সকলেরই কিছু করণীয় থেকে গেল। এক পর্যায়ে এসে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে কাজটাই তাদের মন জুড়ে রইল—কি কারণে এই কাজে তারা নেমেছে তা আর মনেও থাকল না তাদের। নিজের নিজের কাস্তে পরীক্ষা করে নিল তারা। সড়কি এবং বল্লমগুলোয় মর্চে ধরে গেছে—দু'একটি বাতিলও হয়ে গেছে, ঢালগুলির বাঁশের ছাউনীতে ঘুন ধরেছে হয়তো। এইরকম অসংখ্য মেরামতের কাজ করে নিতে হচ্ছিল দ্রুত হাতে। বাড়ি থেকে বাড়িতে সংবাদ আদান প্রদান হচ্ছিল এবং গাঁয়ের পথে আজ অনবরত লোকজন হাঁটাহাঁটি শুরু করেছিল। মোট কথা যে সময়ে গাঁয়ের মানুষ খেয়েদেয়ে কুপি নিভিয়ে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে যায়—নির্বিবাদে মড়ার মতো পড়ে থাকে—এমনকি মহাবিপদেও যাদের জাগিয়ে তোলা কঠিন—ঠিক সেই সময়েই সমস্ত গ্রামটি উত্তেজনার অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু জ্বলে ওঠেনি কোনক্রমেই, ধুমিয়ে উঠেছে। অসময়েই কামারশালে আগুন জ্বালানো হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথার ধার বেড়ে গেছে এত বেশি যেন হিসিয়েই উঠছে ফিসফিস কথাগুলি।

কিন্তু যে ব্যাপারটা সবচাইতে বিস্ময়কর—রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য তা হোলো নিশানাথকে ঐ রাতেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখা গেল। নানাধরনের কাজের জন্যে যারা বার বার যাতায়াত করছিল তাদেরই চোখে পড়ে দৃশ্যটা। এতে তারা যতো না অবাক হয় তার চেয়ে বেশী ভয় পায়। নিশানাথ কি সদ্য সদ্য ভূতে পরিণত হয়েছে? তার মৃতদেহটি ঘরে পড়ে থাকতে থাকতেই? তারা নিশানাথের বাড়িতে চলে আসে। তার বউ তখন রান্নাঘরে বসে রুটি তৈরী করছিল। নিশানাথকে উঠে বসতে দেখে এমনিই অসহ্য আনন্দ হয়েছে তার যে বহু অনুনয় বিনয় করে গফুরের মুদিখানা থেকে আধসের আটা এনে ফেলেছে ধারে। খুব নিবিষ্ট মনে কাজ করছিল সে। বাড়িতে হঠাৎ লোকজন দেখে ভারি চমকে উঠল।

উঠে বসিছো মনে হতিছে কবিরাজ।

এট্রু ভালো লাগতিছে এ্যাহন—বিরসমুখে নিশানাথ বলে। এতো রাত্তিরে কি মনে করে?

এই দেখতি আলাম তোমারে।

অ—নিশানাথ আবার হেলান দিয়ে বসল। তার ছেলেমেয়েগুলো যত্র তত্র শুয়ে আছে। বিছানা সবারই জোটেনি—চ্যাটাইয়ের উপরেই শুয়ে পড়েছে ময়লা চাদর মুড়ি দিয়ে। নিশানাথ বেশ আরামেই শ্মশান জাগিয়ে বসে আছে।

অসুখটা ভারি বাড়িছিল তো তোমার—তাই জিগগেস করতিছি।

হাঁপানীতে ও রহম হয়ে থাহে।

তার বউ রুটি নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, কবিরাজের ধন্বন্তরী এট্টু খাইয়ে দেলাম—তাই খায়ে উঠে বসল কবিরাজ—ওষুধটা খুঁজে বার করতি পরাণ বারোয়ে গেছে আমার। মুখ টিপে হেসে সে আবার ঘরের বাইরে চলে গেল। নিশানাথ বাগিয়ে বসে খুব সইয়ে সইয়ে রুটি খেতে লাগল আলুবেগুনের তরকারি দিয়ে।

এ ব্যাপারটাও খুব তাড়াতাড়ি সবাই জেনে ফেলল। এবং এতে সবার উত্তেজনা বরং বেড়েই গেল। নিশানাথ কি অজেয় প্রাণশক্তির জোরে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলো তা ভেবে তাদের খুব অবাক লাগল। তাকে যে কতকগুলি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল—হতে পারে তারই জোরে সে ফিরে এসেছে। তবু অভিজ্ঞরা বলছে ভবলীলা সংবরণ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না—কারণ যে মানুষ খাবি খায় সে আর উঠে বসে রুটি খেতে পারে না। কাজেই বলতেই হয় ইতিমধ্যে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। এই সময় অনেক দূরে থেকে মানিক বা অবলার চিৎকার শোনা গেল। গভীর মোটা ও ঘষা একটা গর্জন। খুব পরিষ্কার শোনা গেল—কারণ রাত বলে অন্যান্য কোন শব্দ তো ছিল না। এত স্পষ্ট এলো আওয়াজটা যে কারো কারো সন্দেহ হোল সেটা নিচে থেকে আসছে এবং এখুনি গভীর গর্জনে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

যতো তাড়াতাড়িই হোক না—এতবড়ো একটা কান্ড গুছিয়ে তুলতে একটু দেরিই হয়ে গেল। গাঁয়ের বাইরে আসতে আসতে কালো অন্ধকার আবছা হয়ে এলো। নেতা বা কৃষক-কর্মী অনর্গল বক্তৃতা দিয়েও এটা এড়াতে পারল না। তবু খুশী হয়ে ওঠার কারণ ছিল তাদের। এতবড়ো কান্ডের নায়ক হিসেবে গর্ব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাইরে এসে ঠান্ডা বাতাসে অত্যন্ত শীত করছিল তাদের—কানমাথা চাদর নিয়ে ঢেকেও হিম ঠেকাতে

পারছিল না। এক জায়গায় গদাগাদি দাঁড়িয়ে চাষী সুলভ নির্বকার মুখে পূর্বদিকের লাল আকাশের দিকে চেয়ে তারা কি ভাবছিল তারাই জানে—প্রচণ্ড একটি শব্দে তাদের ভীষণ চমকে উঠতে হোল।

ঝোপঝাড় ভেঙে লেজ উপরে তুলে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে অবলা প্রাণপণ দৌড় লাগিয়েছে, পিছনে মানিক। রাজকীয় বিশাল শরীর, উঁচু ককুদ সরু সরু সুঠাম পা। মাঝে মাঝে থেমে গর্জাচ্ছে সে। অবলা এতো জোরে দৌড়াচ্ছে যে তাকে লম্বাটে লাগছে।

ঘটনাটিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে দুর্বোধ্য কারণে সমস্ত মানুষ এক সঙ্গে গভীর খাদ থেকে চিৎকার শুরু করে তীব্রতার শেষ প্রান্তে গিয়ে থামে।

খাঁচা

সিঁড়ির কাছে এসে হাঁফ ধরল। বড্ডো ঠাণ্ডা। কোণাভাঙ্গা আর সাঁতলা-পড়া। বড্ডো পিছল। অধঃপাতের পথের মতো। সেখানে এসে ভাবল, যেতে পারছিনা। তখন শিশিরের শব্দ। আর সেতার বেজে উঠল। গ্যাঁও গ্যাঁও আওয়াজ অন্ধকারকে ধরে মুচড়ে দিলে কেউ যেন ব্যথায় ককালো। কই আলো আনো—কি করছো ছাই—আলো আনো না—ভারি অন্ধকার যে! সেতার থেমে গেলে চিৎকার। আবার চিৎকার, আলো আনো।

অম্বুজাক্ষ বসে আছে সেতার কোলে। আমাকে খেপিও না এইভাবে। সরোজিনী উঠে এলে হারিকেনের আলো তাকে দেখে বিশ্রী হাসল। অম্বুজাক্ষের সব কিছু প্রকট হয়ে পড়ল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে ল্যাপটানো শনের মতো হালকা চুল। দেয়াল ফাটিয়ে যে অশথ গাছটা উঠেছে তার কালো ছায়া পাগলের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

বসো—নিজের পাশে মাদুরে বসার জন্যে অম্বুজাক্ষ সাদরে আহ্বান করে।

না—কাজ আছে।

একটু বসো। কাজের কথাই আছে তোমার সঙ্গে। একটু বসো।

ছাদে বসে কাজের কথার ঢং ছাড়ো। কথা থাকে নিচে চলো।

তুমি ভাবছ তোমাকে বাইজী ভাবছি আমি তাই না?

হারিকেনের আলোয় সরোজিনীর শিরা-ওঠা শীর্ণ হাত তর্জন করে।

আমি এখন যাব।

কটা পান দিয়ে যাবে?

পান নেই বাড়িতে।

দোকান থেকে আনিয়ে দাওনা—মাতালের ভঙ্গিতে সরোজিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে অম্বুজাক্ষ।

তখন উগরে দেয়। সরোজিনী গল গল করে উগরে দেয়। দ্যাখো কতো বিষ আমার! অতি তিক্ত অতি কঠিন গলায় সে বলে, ছাড়ো। ছাড়ো আমাকে।

সরোজিনীর সামনের বাঁদিকের দাঁতটা পড়ে গেছে। কথা বলতে গেলেই দুর্গন্ধ থুথু বেরিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল।

পান আনিয়ে দাও না কটা দোকান থেকে—আবার বলল সে।

পয়সা নেই। আনবার লোক নেই কেউ এখন।

সূর্য কোথায়?

সে বাড়ি আসবে রাত বারোটার পর।

তুমি কি যাত্রা দলের ঘোষক—এ্যাঁ!

একথার জবাবে হারিকেন রেখে সরোজিনী উঠলো। যেয়ো না সরোজিনী যেয়োনা—তোমাকে আমার ভারি দরকার—এখুনি—সেতারে আকুল হয়ে এই কথাগুলো বাজালো অম্বুজাক্ষ এবং সরোজিনী সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। কাজেই বিকৃত হেসে অম্বুজাক্ষ সেতারে আলাপ চালাতে থাকে। শিশিরের শব্দ কানে আসে না, হাওয়া না থাকায় আলাপের বুকভাঙ্গা শব্দ ছাদেই ঘুরতে থাকে ভূতের মতো—তারপর সিঁড়ির ফাঁক পেয়ে সেদিক দিয়ে নামে—নির্জন বারান্দা ধরে নিবিষ্ট পায়রাদের ওপর দিয়ে শূন্য ঘরগুলোতে গিয়ে ঢোকে।

এইভাবে আজকাল সেতার বাজাচ্ছে অম্বুজাক্ষ। বিশ বছর পর। অবশ্য বিশ বছর আগে অম্বুজাক্ষের হাতে সেতার আনন্দিত হয়ে বেজে উঠত। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। অম্বুজাক্ষ হোমিওপ্যাথি ধরার পর। হোমিওপ্যাথি কঠিন জিনিশ। মনোযোগের ব্যাপার। কিন্তু হোমিওপ্যাথি হোক আর এ্যালোপ্যাথি হোক আজকাল কেউ পয়সা দিতে চায় না। রোগ সেরে গেলে দুটো টাকা দিতে পারে। ক সের চাল দিয়ে যেতে পারে। কিছু শাকসব্জি তরিতরকারি বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারে। কাজেই রোগ সেরে যেতে পারে—টাইফয়েড নিউমোনিয়া যক্ষ্মা ইত্যাদির মতো নির্দয় রোগ না হোক—নিদেন পক্ষে পেটের অসুখ, সর্দি, গাগরম ইত্যাদি সারোনোর মতো হোমিওপ্যাথি জানতে গেলে সেতার চলে না। থেলো হুঁকো হাতে বুড়ো বাপ এসে জিগগেস করলে বাজনাটা ছেড়ে দিলি? ও বাজনায় পাগল সেরে যায়—বেশ লাগত সন্ধ্যেটা। ছেড়ে দিলি একেবারে? তাই অম্বুজাক্ষকে শুনিয়ে দিতে হয়, উপায় কি বলো? জমিজমা শেষ—তোমারও আর কিছু করার শক্তি নেই, একপাল ছেলেমেয়ে। সংসারটা না দেখলে চলবে কেন?

শেষে হোমিওপ্যাথি?

আর কি করি?

একটা স্কুল—মানে একটা টোলের মতো করলে হয় না? আমাদের কুলবিদ্যা—বংশগতবৃত্তি।

অম্বুজাক্ষ বাপের দিকে চায়। হাতে থেলো হুঁকো, গায়ে ময়লা মোটা পৈতে—ঘোলা চোখ।

কি পেয়েছ জীবনে? কিছু পেয়েছ? খড়ম পায়ে চক্কোবর্ত্তিগিরি করেছ। আর তো চলবে না, এখন পাকিস্তান হয়ে গেল—দেশ ভাগ হয়ে গেল—এখন কি হবে?

অতএব সেতার পশ্চিমের অন্ধকার ঘরে সহায়হীন হয়ে ঝুলে থাকে। অম্বুজাক্ষ বাধক, তড়কা, অজীর্ণ আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ হয়ে যায়।

কিছু কি হচ্ছে? বাবা একেবারে ঘরের দরজায় দাঁড়ান।

অম্বুজাক্ষ খুচরো গুনছিল বাজিয়ে বাজিয়ে। ভ্রু কুঁচকে তাকায়। ঠিক যেন চিনতে পারছিল না একটু সময়। তারপর অন্যমনস্কের মতো বলে, এই আর কি। এই যেমন ধরো, বাবা—অম্বুজাক্ষ কথা শেষ করে না অথচ তার মাথার মধ্যে কথা চলে এইভাবে, যেমন ধরো কেউ দিলেনা—ধরো ছেলের পিলে বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু বাপ তার নিজের পিলের উপর ছেলেকে বসিয়ে নিয়ে এসেছে—এই অবস্থায়, হ্যাঁ জমির শেখের কথাই বলি আমি—এই অবস্থায় কার চিকিৎসা করা উচিত আগে আমি বুঝতে পারি না বাবা। আর পেটের পিলে থেকে কিভাবে টাকা বেরুতে পারে বলতে পারো! কিংবা পদ্মপিসীর কথা ধরো—কুসী দুটো দিলে, বাবা মাজ্জনা করে দে, আর পারিনে, যমে নেয় না। এই রকম অবস্থা বাবা বুঝলে? এই রকম। থেলো হুঁকো যেন ফেটে যাবে—কালীপ্রসন্ন চড়াৎ চড়াৎ টানে—দম বন্ধ করে কাশে। হিরণ, (অম্বুজাক্ষের ডাকনাম) অম্বু, আমার মানিক—বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস। আমি চিনি না ওকে। ও চেনে না আমাকে। বাবা, এই বয়েসে তোর কষ্ট মুছে দিতে চাই। প্রয়োজনে মরে গিয়ে। মরে গিয়েও।

খুচরো কতক্ষণ গোনা যায়। অম্বুজাক্ষ তাকায়। রোদের মধ্যে বাবা হেঁটে যাচ্ছে খড়মের আওয়াজ তুলে। কার্নিশে কাক ডাকছে। বাবা ফিরে এসো। অম্বুজাক্ষ ইচ্ছে করে। কালীপ্রসন্ন ফিরে এসে অম্বুজাক্ষের হৃৎপিন্ড ধরে মুচড়ে দেয় কসাইএর মতো।

হিরণ, বাবা দুআনা পয়সা দিবি? অসুবিধে হলে থাক।

কি করবে?

দাড়িটা কামিয়ে আসতাম। হাত কাঁপে, নিজে ক্ষুর ধরতে পারি না।

অম্বুজাক্ষ পয়সা দুআনা ছুঁড়ে দেয়, যাও যাও।

খড়ম করুণ হয়ে বাজে। ফিরে যায়। মহাদ্যুতিমান সূর্য প্রহার করে। সকালে যে সর্বপাপঘ্নকে ডাকাডাকি করেছিল কালীপ্রসন্ন সে।

কে যায়? অম্বুজাক্ষ হেঁকে ওঠে।

অরুণ।

শুনে যাও।

কেউ আসে না শুনতে।

কই অরুণ শুনে যা।

দূর থেকে সে বলে, পরে শুনবো। জরুরী কাজে বেরুচ্ছি একটু।

এই সময় অরুণের মা সরোজিনী আসে। তার কাছে অরুণের ব্যবহারের অভিযোগ করলে সে উকিলের মতো জেরা শুরু করে, কি দরকার ওকে। অম্বুজাক্ষ কোন দরকারের কথা মনে করতে পারেনা। সে কিছুই মনে করতে পারে না। কোন দরকারের কথাই তার মনে আসে না।

ওদিকটায় পাহাড় আছে, তাই না? দুহাতে মাটির উপর ভর করে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে ঝুঁকে আসে, পাহাড় আছে বলছিলে না তুমি? রুগ্ন খুকির মতো বড়ো বড়ো চোখে সে চেয়ে থাকে, পাহাড় না থাকলে ওদিকে যাবো না বাপু—আমার বাবা বলতেন—

ওদিকে পাহাড় কোথায় গো? অম্বুজাক্ষ খেতে খেতে বলে, নলহাটি থেকে তুমি পাহাড় দেখতে পাবে—ছোটনাগপুরের পাহাড়—ঠিক যেন নীল মেঘ, ভারি সুন্দর।

সেখানে যেতে পারব না? সরোজিনী ঠোঁট ফুলিয়ে আবদার করে।

আহা সে তো অনেক দূর—বিশ ত্রিশ মাইল হবে। ওটা তো সাঁওতালদের জেলা।

তাহলে ওখানে বিনিময় বন্ধ করে দাও তুমি। কত কষ্টে দেশ ছাড়ছি। ইণ্ডিয়ায় গেলে বার বার কি বদলাতে পারব? বিনিময় যখন হবে একেবারে একটা ভাল জায়গায় যাওয়া ভালো না?

আচ্ছা সে করা যাবে—এত ব্যস্ত কেন? মনে হচ্ছে যেন আজই যাচ্ছো? অম্বুজাক্ষ বলে।

যেতে যখন হবেই—তখন তাড়াতাড়ি কি ভালো নয়? যত তাড়াতাড়ি মায়া কাটানো যায়। সবাই চলে যাচ্ছে। আমরাও তো যাব।

আমরাও যাব—আমরাও যাব। বাজে। বুকের মধ্যে। এই সব পরিত্যাগ করে, এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে। একটা সজল আকাশ, একটি ঠাণ্ডা বাড়ি, পুকুর ঘাট, শাদা পথ, লতার মিষ্টি গন্ধ, জমির শেখ, পদ্মাপিসী এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠা। নতুন আলোয় চোখ রেখে। সেই নীল পর্বতশ্রেণী, উদ্রিক্ত সমুদ্র চেতনায় দোলে। আমরাও যাবো। অম্বুজাক্ষ খুব তাড়াতাড়ি খেতে থাকে, আচ্ছা, আমাদের এই দেশেরই মতো দেখতে কোথাও গেলে হয় না? যেমন ধরো নদী আছে, গাছপালা একটু বেশী—কোন ঠাণ্ডা জায়গায়? অম্বুজাক্ষ প্রশ্ন করে। অর্থাৎ একই পাখি দেখব—একই মেঘ আর আকাশ— এই রকম কথা বলে ফেলে সে।

কোথায় যাবে?

নবদ্বীপের কাছাকাছি কোথাও। শুধু নবদ্বীপ কেন—ও দেশটাই কতকটা আমাদের দেশের মতো। আমি গেছি তো—বেশ গাছপালা আর সব ছায়া ছায়া।

না বাপু জঙ্গুলে জায়গায় গিয়ে কাজ নেই। কোনো শুকনো জায়গায় চলো।

বাদ দাও এখন এসব কথা—অম্বুজাক্ষ বারান্দা থেকে হাত ধুয়ে ফিরে আসে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তিনটে বছর চলে গেল কিছুই করতে পারলাম না। বিনিময়ের পার্টি পেলেও হয় বনিবনা হচ্ছে না, না হয় গবমেণ্ট একটা কিছু বাধিয়ে বসছে। একটা না একটা গণ্ডগোল লেগেই আছে।

আমাদের কিন্তু পাকা বাড়ি চাই, এই রকম—সারোজিনী অবুঝ হবার ভঙ্গি করে।

সে তো বটেই। এতদিনের অভ্যেস কি ছাড়া যায়! পাকা বাড়ি ছাড়া বিনিময় করব না—অম্বজাক্ষ ঘোষণা করেই আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল, সরোজিনী বলে, পান নিয়ে যাও। ভুলে যাচ্ছিলে নাকি?

বাইরের ঘরে আছি। ভ্যাবলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

ভ্যাবলা নেই বাড়িতে।

কোথায় গেছে?

জানি না—ও কোথায় যায় আমি জানি না।

তুমি ঘুমোও নাকি? জানি না—কি জানো তুমি আঁ? কি জানো

সংসারের—অম্বুজাক্ষ মুহূর্তে খেপে ওঠে এবং যত কথা বলে তত খেপতে থাকে। পাষণ্ডের মতো চেঁচায়, তুমি আছো কি জন্যে? ছেলেপুলে এক একটা মূর্তিমান হনুমান হচ্ছে। বড়োবাবু দাড়িগোঁফ চাঁচতে শুরু করেছেন। এত বড়ো বেহায়া যে বাবার ক্ষুর নিয়ে গেছে চুরি করে। মেজোটি জনহিতার্থে মারামারি করে বেড়ান। তার পরেরটির পাত্তাই নেই। বলি এই যে শুয়োরের পালটি পোষা হচ্ছে—কেন শুনি?

সরোজিনীও রাগে দিশেহারা হলো, তোমার পিণ্ডি চটকাতে। তিন বছর ধরে তো খুব লাফাচ্ছ—ইণ্ডিয়া যাব, ইণ্ডিয়া যাব। কোথায়? হোমিওপ্যাথি করছেন—ছেলেপুলে এমনি মানুষ হবে, আকাশ থেকে টুপটুপ করে দেবপুত্র নামবে তোমার জন্যে!

শানের মেঝেতে খড়ম বেজে উঠল জোরে।

অন্ধকারে ধারালো ছুরির ফলার মতো চিৎকার সাঁৎ করে ছুটে আসে, সাপ, সাপ!

কোথায়, কোথায়? তিনি তো সাপ নন। সাপেদের রাজা তক্ষক। গৃহদেবতা। সবচেয়ে বড়ো আর সুন্দর ঘরটার উত্তর পশ্চিম কোণ ফাটিয়ে যেদিন পান্নার মতো কচি পাতা নিয়ে অশথ দেখা দিল, ঠিক সে দিনই অদৃশ্য চিড়গুলোর সূত্রপাত হোল। অশথের পাতার ভিতরে সূক্ষ্ম জটিল জালের মতো চিড়। তারপর সেই বর্ষার শেষে প্রথম শরতে তিনি এলেন, ডেকে উঠলেন—কট কট কট—তোক্কে তোক্কে এবং মুহূর্তে পাতার আড়ালে চলে গেলেন। ছাদ ইতিমধ্যেই চৌচির হয়ে গিয়েছিল বলে ঘর থেকে বাস সরিয়ে নিতে হয়েছিল। সেই ভাঙা ফাঁকা ঘরেই প্রথম দর্শন হোল সেজো ছেলে অরুণের সঙ্গে। বেশ বড়ো একটা টিকটিকি, সবজে ছোপের শাদা রঙ। উপযুক্ত মারণাস্ত্রের খোঁজে বাইরে আসতেই দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা—কি ব্যাপার?

ঘরে একটা সাপ—মারব।

কই দেখি। দাদামশাই ঘরে এসে সেটার দিকে চেয়ে থাকেন। চোখ কুঁচকে উঠেছে, কপালে অসংখ্য ভাঁজ। কোনো প্রাচীনতাকে দেখছেন? তারপর আর কি? কাঁপতে থাকল ঠোঁট। চোয়াল চিবুক ভেঙেচুরে কেঁদে ফেললেন, এতদিনে দয়া হোল? এসেছো আমার বাড়িতে? থাকো, অধিষ্ঠান করো চিরঞ্জীব! অরুণের দিকে ফিরে বললেন, ওরে সর্প নয়, সর্পরাজ

রে দাদা। খবরদার ওর গায়ে হাত দিসনে।

এইসব কথা বলতে বলতে তক্ষক অশথ গাছে চলে গেল। সেই থেকে এখানেই আছে। আজ চিৎকার শুনে সরোজিনী দৌড়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তাড়াতাড়িতে কুপিটা নিভে গেল বাতাসে। চেরা গলায় চেঁচানি, সাপ কোথায় অরুণ, কোথায় সাপ দেখলি?

এসো না, এদিকে এসো না। তোমার পায়ের কাছেই জঙ্গলে। খবরদার এগিয়ো না—আমি মারছি ওকে।

শুকনো লম্বা ঘাসে সর সর শব্দ। আগাছা আর ঘাস। লম্বা—প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সোনালী ঘাস। কাঁটাঝোপ। সেইখানে দাঁড়িয়ে সরোজিনী আপাদমস্তক থরথরিয়ে কাঁপে। ঐখানে বাঁধাঘাট ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে। কাকচক্ষু জল অন্তর্হিত। সেখানে এই অনাহূত নির্দয় ঘাস। দেয়ালে দেয়ালে বট আর অশথ। সরোজিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে। কিসের খোঁজে যেন অরুণ দৌড়োদৌড়ি করে। প্রেতের মতো লাগে ওকে। অন্ধকার শূন্য ঘরগুলো খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে নৈঃশব্দ।

দাদামশাইয়ের ঘরে আলো নিভে গেছে। হয়তো স্থবির মাথায় কিছুই ঢোকেনা। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। হয়তো আবছা অতীত হানা দিয়েছে প্রাচীন মস্তিষ্কে। দুর্জ্ঞেয় কিছু চলছে বা সেখানে। কাজেই আবার নৈঃশব্দ। অম্বুজাক্ষ বাড়িতে নেই—তামাক খেতে গেছে কোথাও। আর কেউ নেই বাড়িতে। কে ডেকে গেল যেন। পৃথিবী থেকে এইখানে। হাওয়ার মতো শিস দিয়ে উঠল। শ্বসিয়ে উঠল হালকা বড়ো বড়ো ঘাসে। হাওয়াই এমন প্যাঁচ কষলো যে অগ্নিশিখার মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শুকনো ঘাস কেমন লেলিহান হয়ে উঠল আর তার বিরাট দেহের জায়গায় জায়গায় ঢেউ উঠল। কেউ কাটেনা এই ঘাস। সরোজিনী আপন মনে বলে। কি হবে পরিষ্কার করে—সব ছেড়ে তো যেতেই হবে। অম্বুজাক্ষই কি ফিস ফিস করে উঠল?

ইস সব জঙ্গল হয়ে গেছে। অরুণ, ওদিকে যাসনে বাবা, পায়ে পড়ি তোর। কথা শোন্।

চুপ করো তুমি—কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এলো।

সাপ মারতে হবে না, বাবা আমার।

সব ব্যাপারে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করোনা বলে দিচ্ছি। অরুণের হাতে লাঠি। লাঠি ঝাঁকিয়ে আস্ফালন করে চলল। এত নির্দয় যেন লাঠিই পড়লো সরোজিনীর পিঠে।

কোন্ দিকে গেলি? বেরোও বাবা—সোনা আমার।

সেকি আর আছেরে—চলে গেছে। তুই বারান্দায় উঠে আয়।

খবরদার বুড়ি—রোষকষায়িত চোখে অরুণ চায়।

অন্ধকার লজ্জাহর। সরোজিনী অরুণকে দেখে না।

অরুণের কথা শেষ হয় না—অন্ধকারে আর একটা আঁধার-বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। হিস-স-স। দিলিতো শালা কামড়িয়ে—পা চেপে অরুণ ঘাসের উপর বসে পড়লো।

কামড়িয়েছে? কামড়িয়েছে তোকে অরুণ? ভয়ংকর চিৎকার করে সরোজিনী। ওরে তোকে তখুনি বললাম। কি করলিরে—তুই কি করলি?

চুপ করো, কামড়িয়িছে তো কি হয়েছে? কেঁউ কেঁউ করছো কেন?

তুই কি করলিরে বাপ—সরোজিনী বুক চাপড়ে চুলে টেনে একটা কান্ড করে।

মারে যাবো এই তো? বয়ে গেছে বাঁচতে। এই দ্যাখ্ কলা দেখিয়ে চলে যাবো। অরুণ বিরাট অন্ধকারের মধ্যে বুড়ো আঙ্গুল নাড়াতে থাকে।

হোমিওপ্যাথিতে সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে? অম্বুজাক্ষ কিছুতেই মনে করতে পারে না। একবার মনে হয় আছে—একবার মনে হয় নেই। আর্নিকা পালসেটিলা নাক্সভমিকা ইত্যাদি নানা কথা মনে আসে বাজে কথার মতো। তার বাবা কালীপ্রসন্ন অন্ধকার থেকে উঠে আসে না। শেষে সাব্যস্ত হয় হোমিওপ্যাথিতে সর্পদংশনের ওষুধ আছে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির মতো ওষুধ। তবে তার নাম মনে পড়ছে না। হতে পারে জানা নেই। বিদ্যে নেই। হতে পারে স্মৃতিবিভ্রম। যাই হোক ওঝার জন্যে অপেক্ষাই একমাত্র কাজ। ইতিমধ্যে অরুণ নেতিয়ে পড়ে, গাঁজলা ভাঙে কষ বেয়ে।

আমি সত্যি করে মরে যাচ্ছি নাকিরে বাবা—ঘুমের ঘোরে অরুণ বলে। সরোজিনী বলে, অরুণ ঘুমোস না—ঘুমোস না অরুণ, অরুণ, অরুণ—অম্বুজাক্ষ ঝাঁকি দেয়, ঘুমিয়ো না অরুণ ঘুমুলে সর্বনাশ হবে।

কি জানি শালা কি ব্যাপার—বলতে বলতে অরুণ নিদ্রার মধ্যে চলে গেল। ভোরের দিকে সে প্রস্থান করল চিরদিনের মতো।

জানো সরোজিনী, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল?

কিসের সব ব্যবস্থা?

বিনিময়ের—বলেই একটু বিব্রত হাসি হাসল অম্বুজাক্ষ।

অনেকদিন থেকেই তো শুনছি—সরোজিনীর হাতে একটা হাতা, রান্না

করছিল। রোগা মুখের ওপর চকচক করছিল চোখদুটো। একটু মেঘের মতো এসে সেটাকে ঢেকে দিয়ে গেল।

না এবার আর কোন কথা নেই। আমাদের জমিসম্পত্তি সব দেখে গেছে।

পছন্দ হয়েছে? উৎসাহকে প্রশ্রয় না দিয়ে আস্তে আস্তে জিগগেস করলো সরোজিনী।

পছন্দ হবে না মানে—এমন বাড়ি, এমন গাছপালা কোথায় পাবে। শুধু বলল, বড্ডো জঙ্গল—পুকুরটার সংস্কার দরকার। আর বলল বাড়িটাকে তো শেষ করেছেন। অশথ আর বটগুলোকে উৎখাত না করতে পারলে বাস করাই যাবে না। বাড়ি থাকবে না দুবছরের বেশী। বললাম, আপনি এসে নতুন করে পত্তন করুন না। আমরা কি আর আছি এখানে? এবাড়িতে আমরা একরকম মরেই গেছি বলতে পারেন। কেন যাচ্ছেন? ভদ্রলোক জিগগেস করলেন। আপনারা কেন আসছেন? আমি জিগগেস করলাম উল্টো।

কি বললেন?

এই আর কি! ভবিষ্যৎ নেই—নিরাপত্তা নেই। যেমন আমরা বলি আর কি!

এখানে আসলে রাজা হয়ে যাবে ভাবছে না?

তাইতো মনে হোল। সব নাকি নতুন করে বানাবে।

আমিও তাই বলি—আমরাও সেখানে গিয়ে সব নতুন করে বানাব। এমন হয়েছে আজকাল যে চুল নখ বড়ো হলে মনে হয় একবারে সেখানে গিয়ে কাটাবো। তা ভদ্রলোকের বাড়ি কোথায়?

কাটোয়ার কাছে—অগ্রদ্বীপ।

খুব সুন্দর নাম তো!

এমনিতেও সুন্দর। ছেলেবেলায় গিয়েছিলাম একবার বাবার সঙ্গে। কি জন্যে যেন। খুব ছেলেবেলায়। ধব ধবে শাদা মাটি আর বিরাট বিরাট মাঠ। মাঠের বুক চিরে রেল লাইন গেছে। এদিকে কলকাতা, ওদিকে খাগড়া, আজিমগঞ্জ, নলহাটি, ছোটোনাগপুর ঘেঁষে বোলপুর হয়ে বর্ধমান—এইসব।

সরোজিনী রান্না বন্ধ করে দিল। এই সব শুনলে কিছুতেই কাজ করা যায় না।

কি বিরাট দেশ—অম্বুজাক্ষ বলে যায়, কোথায় যেতে চাও—দিল্লী, আগ্রা, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন? অতি অবহেলায় যেতে পারো।

ওদের বাড়িটা কি পাকা?

হ্যাঁ পাকা। ঠিক জানি না। যেখানে খুশি যেতে পারবে—অম্বুজাক্ষ কথা শুরু করে।

কোথাও যাবার দরকার নেই আমার। কোথাও যাব না আমি। ভারি পরিশ্রম গেছে আমার সারাজীবন। চুপচাপ বিশ্রাম নেব সেখানে গিয়ে। আমাকে আর খাটাতে পারবে না তোমরা। একটা ছোট্ট বাগান করে দিও। শিউলি, বকুল, চাপা, গোলাপ এই সব গাছ দিয়ে—এককালে আমাদের যেমন ছিল।

ছেলেমেয়েগুলোকে—এইটুকু বলেই অম্বুজাক্ষ থামল দম নিতে। সরোজিনীও কি বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে গেল। সূর্য আজকাল বাড়ি আসে না। লেখাপড়া ছেড়েছে বহু আগেই। যেখানে-সেখানে মারামারি, বদমাইশি করে বেড়ায়। তার পরের পাঁচজনের দু'জনে বাড়িতে একটু-আধটু পড়াশুনা করে। বাকী তিনজনে পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপে, ঝাড়ে, মাঠে-ঘাটে—ছেড়ে দেওয়া গরুর মতো। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে, ইণ্ডিয়ায় গেলে বাবা আমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, তাই না! নতুন জামা আর প্যাণ্ট দেবে।

ছেলে-মেয়েগুলোকে ভর্তি করে দিতে হবে। গলা পরিষ্কার করে অম্বুজাক্ষ বলল। ওদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আজ যাব কাল যাব করে ওদের ইস্কুলেই দেওয়া হলো না তো। এই বলে একটু চুপ করে হঠাৎ অম্বুজাক্ষ বলে উঠল, হোমিওপ্যাথিতে কিছু নেই আজকাল।

কিছুতেই আর কিছু নেই—সরোজিনী বলে।

তাই মনে হয় আমারো।

তাহলে বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল বলছো?

প্রায়।

আবার প্রায়। এই না বললে হয়ে গেছে?

অনেক রকম বায়নাক্কা আজকাল—সহজে বিনিময় সম্ভব নয় আর।

আর কবে যাবো? বুড়ো হয়ে গেলাম যে।

বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—তাই না?

অম্বুজাক্ষ অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। অশথ গাছ থেকে তক্ষক ডেকে উঠলে চমকে উঠল সে। বাইরে দুপুরের তীব্র রোদ। বাড়ির সামনের লম্বা

ঘাসগুলো শুকিয়ে হালকা হয়ে গেছে।

ঠিক এখন আগুন দেবার সময়, অম্বুজাক্ষ ভাবল, একটিমাত্র দেশলাই কাঠি খরচ করলেই হু হু আগুন জ্বলবে, আগুন এগিয়ে যাবে ছাদে, বরগায়, শূন্য ধানের গোলায়—সরোজিনীর শুকনো হাড়ে। লাগিয়ে দিলে হয়, অম্বুজাক্ষ আবার ভাবলো, তারপর সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরি, বুকে টেনে আনি—তারপর আমি, সরোজিনী, বাবা, সূর্য, বরুণ, কমল, ভ্যাবলা সবাই দাঁড়িয়ে থাকি, সর্বনাশ দেখি—শেষে ধ্বংস হয়ে যাই। কি বিশ্রী কথা—অম্বুজাক্ষ ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না সম্ভবত, চোখ ঘষলো বারে বারে, তখন দেখতে পেল অশথ গাছটা কতো বড় হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠা করা গাছের মতো বিশাল, সবুজ—উত্তর দিকের দেয়ালটায় তলা পর্যন্ত ফাট ধরেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে রোদ আরো তীব্র হয়ে উঠলো আর যেন চোখের উপরেই চড়াৎ করে শব্দ করে দেয়ালটা চৌচির হয়ে গেল।

শীগ্‌গীর একবার এদিকে এসো তো—সরোজিনী সোজা এসে ঘরে ঢুকলো। অবাক অম্বুজাক্ষ তাকায়, কি হলো?

এসো না একবার।

অম্বুজাক্ষ ধীরে-সুস্থে ওষুধের বাক্সো বন্ধ করে। ময়লা কোঁচাটা বার দুই ঝাড়ে ফটফট করে, চেয়ে দেখে সরোজিনী চলে গেছে। বাইরে এসে দরোজায় শিকল তুলে দেখল দ্রুতপায়ে সরোজিনী কালীপ্রসন্নের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সেখানে এসে অম্বুজাক্ষ একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পায়—সরোজিনী দু'হাতে আলিঙ্গন করে আছে কালীপ্রসন্নকে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে তাঁকে তুলতে। কালীপ্রসন্নের চোখ বোঁজা।

বাবার কি হয়েছে?

হঠাৎ পড়ে গেছেন। ধরো একটু, বিছানায় শুইয়ে দিই। কালীপ্রসন্ন তারপর নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে থাকেন।

কতবার বলেছি, বুড়ো মানুষ কোন কাজ নিজে করার দরকার নেই। কিছুতেই শুনবে না। হলো তো—ভোগো এখন ছ'মাস। হোঁচট খেয়ে পড়েছে নিশ্চয়। অম্বুজাক্ষ ভারি তেঁতো গলায় এইসব কথা বলে। কিন্তু শোনা গেল কোন কিছুতেই হোঁচট খাননি কালীপ্রসন্ন। খড়ম খুলেও যায়নি। হাঁটতে হাঁটতে বিনা কারণে পড়ে গেছেন।

অম্বুজাক্ষ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, শেষে বলে, তাহলে হয়ে গেল?

কি?

পক্ষাঘাত।

তক্ষকটা তখুনি ডেকে ওঠে। কালীপ্রসন্ন চোখ মেলে ডাকেন, হিরণ।

অম্বুজাক্ষ বিছানার কাছে যায়। কালীপ্রসন্নের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, বাবা, কিছু বলছ?

আমার কি হয়েছে হিরণ?

কিছু হয়নি তোমার, এমনি পড়ে গেছো।

ডান দিকটা হঠাৎ কেমন অবশ হয়ে গেল, মাথা ঘুরে উঠল—

শরীর দুর্বল থাকলে অমন হয় বাবা, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কালীপ্রসন্ন ডান হাতটা নাড়াতে চেষ্টা করেন, হিরণ আমি হাতটা নাড়াতে পারছি না।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

কালীপ্রসন্ন যেন কিছুই শুনতে পান না, দেখতে পান না, পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, তবে কি আমার পক্ষাঘাত হয়ে গেল রে? না মরে গিয়ে আমি কি তাহলে ফাঁদে পড়ে গেলাম?

অম্বুজাক্ষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কালীপ্রসন্নের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গাল ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছে—জটিলগ্রন্থিতে দুর্বোধ্য লাগছে কদাকার মুখ।

মানুষ নিজের ইচ্ছায় মরতে পারে না হিরণ, তবে নিজেকে মেরে ফেলা যায় ইচ্ছে করলে। আমাকে মেরে ফ্যাল বাবা, তোর পায়ে পড়ি, তোর ভাল হবে—আমি আশীর্বাদ করব তোকে।

কি পাগলের মতো বকছ—অম্বুজাক্ষের মনে আস্তে আস্তে বিরক্তি বাসা বাঁধে।

আমাকে একটা কিছু দে, খেয়ে মরি। আমি এক্ষুনি মরে যেতে চাই। হিরণ, বাবা আমার—কালীপ্রসন্ন জড়িয়ে জড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে।

এরকম করলে আমি এখুনি চলে যাব।

তাহলে আমি কি করব বলে দে।

চুপচাপ শুয়ে থাকো।

বুড়ো মানুষকে কাঁদতে দেখলে অম্বুজাক্ষের বরাবরই আশ্চর্য লাগে যদিও সে জানে একমাত্র বুড়োরাই কাঁদতে পারে ছেলেদের মতো। তবু শিশুদের কান্নার চেয়ে বৃদ্ধের কান্না অসহ, কারণ সে তার কান্নার মধ্যে সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ঢেলে দিতে পারে। কালীপ্রসন্ন সেই তেঁতো কান্না

কাঁদে। তার স্বস্তিহীন কান্না নড়েচড়ে বেড়ায় ঘরের আনাচে কানাচে—সবশেষে সরোজিনীকে কাঁদায়। সরোজিনী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দশ বছরের মেয়ের মতো কাঁদে। এই সময়ে ভারি নাটকীয়ভাবে সূর্য এসে ঢোকে। লুঙিটা হাঁটুর উপর তুলে পরেছে, খালি গা, গুলীখোরের মতো চোয়াড় চেহারা—এসেই কালীপ্রসন্নের বিছানার দিকে চেয়ে স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

তার কথার কেউ জবাব দেয় না।

সংএর মতো সব দাঁড়িয়ে আছো কেন?

তোর দাদামশাই-এর পক্ষাঘাত হয়ে গেছে রে সূর্য—ফোঁপাতে ফোঁপাতে সরোজিনী জবাব দেয়।

কি হয়েছে?

পক্ষাঘাত।

হয়ে যখন গেছেই কি আর করবে? কাঁদছো কেন ফোঁস ফোঁস করে?

তার কথা এত রূঢ় আর অমানুষিক শোনায় যে কালীপ্রসন্ন পর্যন্ত লজ্জায় কান্না থামিয়ে ফেলে।

ওষুধ-পত্র করো আর কি, না মরা পর্যন্ত—সূর্য তেমনি হিসহিসে হিংস্র কণ্ঠে বলে, তারপর লোহার মতো কঠিন হাতে সরোজিনীর ডান হাতটা নাড়া দিয়ে আদেশ চালায়, দুটো ভাত দাও তো—খেয়ে একটু বেরুবো—এই বলে সে বাইরে চলে যায়।

এই শহরেও শিয়াল ডাকে কেমন দ্যাখো—সরোজিনী চলে গেলে অম্বুজাক্ষ সেতার কোলে ভাবে। বাস্তবিকই, যেন হাজার হাজার শিয়াল চীৎকার করছিল একসঙ্গে। ভারি ঠাণ্ডা ছিল তখন বাতাস। এরই মধ্যে তক্ষকটা ডেকে উঠল কট্ কট্ করে। সেতার থামিয়ে অম্বুজাক্ষ বিরাট অশথ গাছটার কাছে গেল। সাবধানে যেতে হোল। চুলের মতো সরু শিকড়গুলো এখন বড় বড় ফাটল হয়ে গেছে। হাঁ করে আছে। মাঝে মাঝে আজকাল ইট পর্যন্ত খসে পড়তে শুরু করেছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু অম্বুজাক্ষ জানে দু'-একটি ফাটল এত বিরাট হয়ে গেছে যে, পা পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে ভিতরে।

অশথ গাছটার নিচে গেলে ছাদ যেন দুলতে শুরু করল। সেখানে দাঁড়িয়ে অম্বুজাক্ষ তীক্ষ্ণ চোখে তক্ষকটাকে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু পাতার

ফাঁকে শরতের ঠাণ্ডা বাতাসই শুধু শিস দেয়। অনেক চেষ্টার পর হতাশ হয়ে অম্বুজাক্ষ হাত থেকে ইটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে আসে। ছাদে শেওলার আস্তর এতো পুরু যে, গালিচার মতো নরম লাগল তার, আর এই আবেশে থাকতে থাকতে এমন পিছল একটা জায়গায় এসে পড়ল যে, আর একটু হলেই পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল অম্বুজাক্ষ। বহু কষ্টে সামলাতে হোল। তার বুকের ভিতরে হাতুড়ি পেটার মত ধক্‌ধক্‌ আওয়াজ সে শুনতে পেল।

সরোজিনী কি তাহলে আসবে না? এই ভাবতে ভাবতেই সরোজিনী এসে হাজির, নিচে চলো, খেয়ে নেবে। আমার কাজ আছে বিস্তর।

একটু বসো না সরোজিনী—অম্বুজাক্ষ গলাটা কাঁদো কাঁদো করে ফেলে।

আজ তোমাকে কি ভূতে পেয়েছে? এরকম করছো কেন?

একটু বসো সরোজিনী—অম্বুজাক্ষ মন্ত্রের মতো একটা কথাই আওড়ায়। মাদুরের এককোণে সরোজিনী বসে।

সে বসলে অম্বুজাক্ষ চুপ করে যায়।

আমরা আর যাচ্ছি না সরোজিনী—অনেকক্ষণ পর একটি একটি করে উচ্চারণ করে অম্বুজাক্ষ, তারপর কথাটার অনতিক্রম্য বিষাদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে বলে হাসতে হাসতে, যাওয়া গেল না আর কি। সব গোলমাল হয়ে গেল। গিয়েই বা লাভ কি বলো? একই কথা। খবরাখবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয় এখানে তবু খেতে পাচ্ছি দু'মুঠো—সেখানে লোকজন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। সরোজিনী চুপ করে থাকে।

কোথাও যাব ভাবতেই ভাল—যাওয়া ভালো না। তাই না? এতদিন যাব যাব করে কাটালাম। এখন যেতে হবে না ভেবে দেখি কেমন লাগে—অত্যন্ত আবছা অস্পষ্ট কথা চালিয়ে যায় অম্বুজাক্ষ।

তাছাড়া সবাই কতো ভালোবাসে—সবচেয়ে বড় কথা বাবার এই অবস্থা, মানে মানে—না মরে যাওয়া পর্যন্ত—

কথাগুলো এতো এলোমেলো হয়ে যায় যে, তার মাথামুণ্ডু ধরা যায় না। তাছাড়া সরোজিনী ঠিক প্রেতের মতো বসে আছে। সেজন্যে বাধ্য হয়ে অম্বুজাক্ষ আবার সেতার তুলে নেয় আর কত দ্রুতই না দেশরাগের অভ্যন্তরে চলে যায়।

শেষ শরতের উছলে পড়া কালো আকাশের মতোই সুর উপচে উপচে পড়ে। হারিকেনের লাল আলো আরো লাল হয়ে যায়। অম্বুজাক্ষ দুই চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ে তালে তালে।

এই সময়ে বিকট আওয়াজ করে সেতারের খোলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেলে অম্বুজাক্ষ চোখ মেলে সরোজিনীকে দেখতে পায়। সে তখন হাতের ছোট লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হারিকেনটা তুলে নিয়েছে। সেটা চুরমার হয়ে গেলে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে এগিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ বার বার চেঁচায়, মিনতি করে, সরোজিনী, আমাকে নয়, আমি নই।

জীবন ঘষে আগুন

রাজার হাতি এসে গেল। তার মেঘের মতো শরীর, তার স্থূলোদর, সেই মহাকায় পদচতুষ্টয় নিয়ে হেলতে-দুলতে মাঠের মাঝখানে দেখা দিল। সেখানে কোনো বৃক্ষ ছিল না, কোনো বট বা অশ্বথ—শুধু কিছু কাঁটাগাছ, পান্‌সে-ছায়া বাবলা, বড়জোর শেয়াকুল ধরনের গুল্ম এইসব মাঝে মাঝে। আর অনেক বড় লাল মাঠ—গরমের তাড়সে পীড়িত অসংখ্য গর্ত ইত্যাদি। রাজার হাতির পা বসে যাচ্ছিল বারে বারে—এই রে ভগোমান—আতঙ্কে ও স্নেহে বলাবলি চলছিল—যারা মাঠ ভেঙে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিল রাজহস্তীকে তাদের মধ্যে। ভুস্‌ করে পা দেবে গেলে কখনো করীটি দাঁড়িয়ে গিয়ে আর-শোলার মতো শুঁড় নাড়ছিল—কি রকম বোকা বোকা যেন ; তার পিঠের উপর পেটমোটা বাবুরা মহাবিপন্ন বদন ব্যাদান করে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কতদূর, আর কতদূর! আসলেই অনেক দূর ছিল। হাতি গায়ে লাগাবে ডান দিকের দু'টি গ্রামের ছায়া, আর কিসব নিবিড় চালচিত্রই বা পেরিয়ে গিয়ে তারপর সুউচ্চ মাটির স্তূপ। সেখানে রোদ-পোড়া মাটির গন্ধ আসছে এবং তালগাছ বসানো সেই পাড়ির পরে মজাদিঘি। তবে তো স্থির জলরাশির দর্পণ সামনে রাখা মহীরুহ বট পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে গ্রামের কোলে ধূলি দেখা যায়, মেঘসম, রুখু ধূলি, ইতস্তত সঞ্চরণশীল, এমন যে গাঁয়ের সবুজ রেখা অদৃশ্য হয় এবং বালকেরা দেখা দেয়। তাদের হাতে পাঁচনবাড়ি—তারা সংখ্যায় অনেক, একটি বাহিনীর মতো। আদুল গা, ধূলিলিপ্ত গামছা পরনে, কেউবা জন্মদিনের পোষাকে। তারা চেঁচায়, হাতি আলচে, মেলার হাতি আলচে, আবার বলে, হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি। এইরকম বলতে বলতে তারা হাতির পেছন নেয়। বৈশাখ মাসের শেষ দিনটির দুপুরের আকাশে কুত্রাপি মেঘ নেই—তাই আকাশের দিকে চেয়ে পেটমোটা বাবুদের চোখ টন্‌টন্‌ করে—তারা আহা আহা করে ঘাম মোছে। হাতি বসে পড়তে চায়, ছায়া পেলে শুয়ে। কিন্তু ছেলেরা বলে, মাউতের হাতে লোহার

ডাঙশ, শালা দেঁড়িয়ে পড়লে দেখিস শালার কি দশা হয়। আর পিছনের মাথায়বড়ো অতি শীর্ণ ছেলেটি ধূলির উপর হাতির পায়ের মসৃণ ছাপের উপর শরীর গড়িয়ে দেয়, হেইগো আল্লা,. হেইগো আল্লা। ক্যানেরে গড়াগড়ি খেছিস ক্যানে, অরে ঔ, গড়াগড়ি খেছিস ক্যানে? ধূলিশয্যায় থেকে লম্বা খেঁকটে মনুষ্যশাবকটি উত্তর দেয়, সুমুন্দি, অরে সুমুন্দি, হাতির পায়ের ছাপে গড়াগড়ি খেয়ে আমিও হাতির মতুন মোটা হবো। তাই লিকি? তাই লিকি? অধিকাংশই তখন—সেইসব রাখাল বালকদের সবাই তখন মাটিতে লুটোপুটি খায়, হাতির মতুন গোদা করে দাও গো আল্লা—হেই আল্লা। তারা লাল রঙের মাঠের উপর আপন আপন হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে নাচতে নাচতে বলছিল তাদের পুরুষ্টু ক'রে দিলে কত কি সুবিধা হয়। তারা লাঙল চালানোর মহড়া দিচ্ছিল, গরুর গাড়ি চালানোর টোকা দিচ্ছিল টাকরায় জিব ঠেকিয়ে. চ, চ, দিঘেই, আর একে অপরের গায়ে পড়ে হেসে কুটি কুটি হয়ে বলছিল, জমির ধানের ভাগ লিবি লিকিরে ভুড়িঅয়লা মাহাজোন? আয়না, এগু কল্লা দে। হাত উপরে তুলে ধরার জন্যে তাদের পেটের চামড়ায় টান পড়ছিল আর তারা যে অভুক্ত এইরূপ অকাট্য প্রমাণ তাদের বিবর্ণ চামড়ায়, দুর্বল পাঁজরে জিরজিরিয়ে নড়ে চড়ে। আবার হাতির পা বসে যায় গর্তে—শুকনো বাতাস সেই গর্তের ধূলি নিয়ে পাক খেয়ে শূন্যের দিকে উঠে যায়। ওরা চিৎকার করে বলে, হেই ভগোমান—তক্ষুণি পাশের ঝোপ থেকে একটি বিশাল বোড়া সাপ নির্জীবভাবে এগিয়ে আসে, তারা আরও বলে, মধুসূদনই কাণ্ডারী—সেই-ই বিপদ থেকে বাঁচায় গো ; দেখছো না গর্ত থেকে বাইরে গিয়েছে মা মনসার চেলারা। বিছ্রাম লিচে ঝোপের হেঁয়ায়, লয়কো? বালকেরা বলে।

রাজহস্তী পিছনের পা-দু'টি টেনে টেনে চলে। দেশটি বর্তমানে দিকহীন থ্যালানো একটি পাত্রের মতো—মাঝখানে ঢালু এবং কিঞ্চিৎ ঢেউ-খেলানো—যার কিনারায় অস্পষ্ট গ্রামরেখা, কখনো কখনো ছিন্ন—সেখানে ধোঁয়াটে দৃষ্টিহীনতা। এই পাত্র তপ্ত, তাতানো কাঁচের মতো ঠন্‌কো হালকা —কোনো কারণে বহ্ন্যপাৎ হলে শূন্যে বিস্ফোরণযোগ্য—কারণ মাইলের পর মাইল কোনো ছায়ার ভার নেই—সজলতার ওজন নেই। তাই জ্বলে—চিৎকারে কাঁপে কাঁসার পাত্রের মতো। রাজহস্তী হারিয়ে যেতে থাকে—তার পিঠের উপর যারা ছিল তারাও। এমনকি শুঁটকো চেহারার যে মানুষটি হাতির ঘাড়ে বসে বসে তাকে উৎপীড়ন করছিল সেই মাহুতটিও। শেষ বোশেখের তীব্র রোদে প্রান্তর বিরক্ত বর্ণচোরা গিরগিটির ঘাড়ের মতো আগুনে-লাল। দিশাহারা

হয়ে হস্তী দাঁড়িয়ে পড়ে—মাহুত দুর্বোধ্য চিৎকার করলে সে ধূলিধূসর খস্‌খসে পিছনের পা-দু'টি টানতে টানতে ইতস্তত যায়। সঙ্গের মানুষগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলে, জল দাও ভগোমান—অমন ভুরকুট্টি করতে নেগো না। অর্থাৎ বৃষ্টি না হলে যাবো কোথায় হে কাণ্ডারী—এখন এই যে আমাদের চোখ ধেঁধে গেছে, এজন্যে এই মাঠে পথ হারিয়েছি। ছেলেরা অন্যমনস্কে বলে, শালোর হাতি কুলের আঁটিতে জব্দ—শালোর নখের ফাঁকে কুলের আঁটি এটকে যায়নি তো মালিক!

উ একটু জল চায়গো—জলে চান করবে, জল তুলবে হুস্‌হুসিয়ে—হাতি শালা জল চায়।

একটি ছেলে বলে তা বাদে কলাগাছ খাবে ঘসর ঘসর খচমচিয়ে—এমনি শালো—গা ধুয়ে কেমন কালো কুচকুচে তেলপানা হবে। এই বলেই সেই ছেলে তার আরও বাল্যের স্বপ্নে ডুবলো গলায় গলায়ঃ ধুলো ভেঙে দুপুরের গরম রোদে পথ হাঁটতে হাঁটতে এমন স্বপ্ন জমে যায় তার যে সে. ঐ ছেলেটি অকূলে হাবুডুবু খায়, যেন তার হাতের বাঁশি এখুনি বাজছে, যেন পাকা আমের গন্ধে তার বর্তমানে শূন্য পাকস্থলী পাকিয়ে উঠছে। আরও সে দেখে লোকের মেলা, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরাট গাঁ-টির নিচু নিচু ঘোরানো রাস্তায়—কতো তারা গো—কতো, কোথা থিকে আলচে এতো নোক আর কি সব মেঠাইয়ের দোকান গ—অঃ শালো জিবে পানি আসে যি আর হিঁদুরা কতো পাঁটা কেটে লিয়ে যেচে—কাঁদে করে লিয়ে যেচে এন্তার পাঁটা—মাতা নাই একটোরও—সিসব কামারে লিয়েচে। মজা কতো মেলায় আর নামোয় এতো নোক, এতো আওয়াজ, এতো মজা—ওপরে হাতিটো কেমন কালো কুচকুচে, কলার পাতা খেচে।

বালকটির দিবাস্বপ্ন বড়োই সংক্ষিপ্ত—যেনবা আরম্ভ হতেই শেষ হয়ে যায় এবং সে পিপাসায় যৎপরোনাস্তি কাতর, গলা তার শুকিয়ে কাঠ, এবং তার নাড়ি পাক দিয়ে বমন উদ্রেককারী এবং সে সম্ভব করে তুলতে পারলে লাল ধুলোই খেয়ে নেয় এক আঁজলা, আর এই অরণ্যে কোথাও জল নেই এবং রাজহস্তীর রঙ কটা, সেই নধর শ্যামজলধরকান্তি পলাতক—ধুলোটে বিশ্রীই বরং—পরন্তু এখন খোঁড়াচ্ছেন তিনি। জল খেতে চাই, পেটমোটা বাবুরা বলে, কিন্তু এই মৃত ভূভাগে মনুষ্যই বা কোথায়, জলাশয়ই বা কোথায়—কাজেই, অতঃপর বাবুরা চুপ ক'রে যায়—চোখ মিটমিটিয়ে পিছনে জনতার দিকে চায়। ধান কাটার পর নাড়াগুলি জমিতেই রয়েছে, অতঃপর এই ধান কোথায় যায় ভেবে একটি বাবু পেটে হাত রেখে গভীর উদ্গার তুলে

বলে, জল খাবো। সূর্য ঠিক তার তালুতেই বসে শাবল চালাচ্ছে, হাতির ছায়াটি শুয়োরের মতো—আরও অদ্ভুত পিছনের জনতাটি অদৃশ্য হয়েছে। শুধু মাঠের উপর শীর্ণ এক দঙ্গল ছায়া নেমে আসে। তখন প্রাণবন্ত সেই লম্বা ছেলেটি লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে বলে হাতিটো কানছে ক্যানের‍্যা—অ দেখ, অর চোখ থিকে লুই গড়াইছে। হাতি এই কথায় দাঁড়িয়ে যায় বটে কিন্তু স্বপ্ন-দেখা বালকটি আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে। তাতে বিকট শব্দ হয়—ছেলেটি তলপেট চেপে ধুলোয় মুখ ঘষে। দলপতি লম্বা বালক পা দিয়ে চিৎ করে তাকে, হাতি আল্‌চে তো তোর বাপের কি—মেলা হবে কালকে, হাতি যাবে মেলায়, কতো নোক আসবে। তা তু শালো এলি ক্যানে—তোর বাপের কি! বালকের ধূলিভর্তি কণ্ঠ থেকে লাল ধুলো আর ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ বেরোয়, আল্লার কিরে—আমি মেলায় যাবো। এই বলে সে নিশ্চল হয়।

মৃতকে দেখার জন্যে যেমন সারি দিয়ে দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে যায় তেমনি ক'রে ছায়াগুলি তাকে ঘিরে দাঁড়ায় কঠিন মুখে। হয়তো কিছু খেলে আর জল পেলে সে আবার মিছিলে থাকতে পারে এই সম্ভাবনায় তারা রাজহস্তীকে ঘিরে ধরে। কি জানি বা দাঁতে ছিঁড়বে কাঁচা হস্তীমাংস—সেই তাদের তীব্র চোখ জ্বলে, ও বাবুরা, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমাদের কিছু দিয়ে যাওনা বাবুরা—কিছু চাল না হয় পয়সা। মেলা এবার হচ্ছে না। কে যাবে মেলায় গো? কেউ যাচ্ছে মা, মায়ের বলি নাই এবার—মায়ের উপোস। যেমন ছেলের উপোস, তেমনি মায়ের উপোস। বাবুরা ফিরে যাও। তারা আরও বলল, দিঘির মাঝখানের গহীন হিম জলরাশি থেকে পাথরের মাতৃমূর্তি ঘাটে উঠে আসবে না এবার যেমন অন্য অন্য বারে আপনি এসে আপন অপূর্ব মুখশ্রী তুলে ধরে কয়, বাছারা এলাম। তারা আরও বর্ণনা করল কেমন ক'রে ভোরবেলাকার প্রথম বাতাসটি আসে—নেড়ামাথা বামুন বিশাল টিকি নাড়ে আর ফোকলা দাঁতে হেসে হেসে বিগলিত হয়—তারপর কিভাবে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেলে মা মা রব ওঠে, গা ছম্ ছম্ করে আর টুক ক'রে মায়ের মূর্তি পাড়ের কাছে চলে আসে। এইসব অতি সত্বর বর্ণনা ক'রে ছায়াময় জনতাটি বলে, বাবুরা ফিরে যাও, ইদিকে কেউ বেঁচে নাই বটে—ফেরো বাবুরা। সর্বশেষে তারা গালিবর্ষণ ক'রে বলে, শালারা বাড়ি যা, মেলায় কেউ যাবে না, হাতি গিয়ে কি হাতি হবে! বাড়ি যা—যেখানে শুড়শুড়ি হচ্ছে সেখানে চুলকুগে যা। আরূঢ় ব্যক্তিরা তখন অপমানিত হয়ে দু-একটি আনি দুয়ানি সিকি ছুঁড়ে আবার রাজহস্তীর পথ ক'রে নেয়। কারণ আরম্ভ করলে ফিরবে কেমন ক'রে?

তথাচ তথায় জনসমাগত শুরু হয়েছিল। চারিপাশের জনপদসমূহ হতে দুর্জ্ঞেয় সংস্কারের টানে বা কিছু অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় অথবা অভ্যাসে বা শূন্যোদরের প্রতিপক্ষ হিসেবে উৎকট উত্তেজনার খোঁজে যারা আসতে শুরু করেছিল মাঠ এবং বনবাদাড় ভেঙে তারা হয়তো ভেবেছিল আমরা এই মেলায় যাই ; অতি পবিত্র পীঠস্থান এইটি, আমরা মায়ের সন্তান—যদিও অন্নপূর্ণার ছেলে আমরা, আমাদের ধান উঠল অন্নপূর্ণার বেজম্মা বাপের বাড়িতে, বিটি সেখানে দাসীবিত্তি করে। তবু আমরা মেলায় যাবো, কারণ স্থানটি পবিত্র—এইজন্য যে সতীর দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী এই স্থানেই ছিটকে এসেছিলো। অতএব এটি আমাদের পীঠস্থান ; আরও মা যে খিদের চোটে তলপেট চেপে ককাচ্ছে—বেটি তো ইচ্ছে করলে কোনো ভুঁড়িঅলা জোতদারের ঘর করতে পারে—তবুও আমরা মেলায় যাবো, যদিও দেশের আকালে কে কারে কথা কয়, নধরকান্তি কিছু দেখলেই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়, তবু যদি মেলায় গেলে কোনো ফন্দিফিকির হয়! আর একদল ভাবল, আমরা মায়ের গল্পে বিশ্বাসী না, তবু মেলায় যাবো, কতো রকম রংবাজী, ঠকবাজীর আমদানি সেখানে। খিদেয় যদিও চোখে দেখতে পাইনা তবু আসমানের আল্লা আমাদের ভুলেছে বলে আমরা কি পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁদিয়ে বসে থাকবো? অতএব, দেশটি জ্বলে ছারখার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, অতি ভয়ংকর বারুদের কটুগন্ধের মধ্যেও ; আর যেভাবে মরুভূমির মতো খোলা দেশে বিরাট বিরাট মাঠ ঝেঁটিয়ে হাহাকার আসছিল তাতেও সারি সারি মানুষের চলার বিরাম ছিল না। মেলায় যাবার পূর্বে দিঘিটি দৈর্ঘ্যে পাকা এক মাইল ছিল, তার পূর্ব পশ্চিম দুই পাড় যেন অতিকায় পাহাড়—অথচ তার গর্ভে একটুও পানি নেই—হায়রে ঘাসও যা ছিল গরুতে সাবাড় করেছে, কেমন পদ্ম ছিল এককালে, এখন তাদের বংশমাত্র নেই—সেই দিঘিতে বিশাল নরমুণ্ড পাবার পর আর কি সন্দেহ থাকতে পারে সর্বনাশের! জনপদসমূহ হতে এই দিঘির পাড়ে যারা আসতে থাকে, তাদের মহাপ্রস্থান পথের যাত্রী বলে মনে হয়—দলে দলে তারা আসে, হাঁটুভর্তি ধুলো আর ঘন বাদামি চামড়ার রং। তাদের চোখে রুক্ষ ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। কিন্তু তারা কখনো পাঁঠাগুলিকে ফেলে আসে নি। অন্ততঃ একটি দিনের এই চমৎকার ভোজ্যের পায়ের খুর থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত যেখানে পুনঃপুনঃ লোভায় সেখানেও আছে শক্তিধর বাধা। মায়ের বলি কাজেই টুকটুক অনুসরণ করে তীর্থযাত্রীকে। অতএব স্থানটি অজে পরিপূর্ণ। এই পশুগুলির চোখের জলে তাদের লোমশ গন্ডদেশ ভিজে—তাদের চিৎকারে শূনোদর ঢোলের মতো বাজে—

তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যাবানিতে অতিষ্ঠ পুজার্থীর আছড়েই তাদের প্রাণবধের বাসনা হয়। আরও স্থানটি কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে অবস্থিত—একটি দিঘির পূর্বপাড়—সেখান থেকে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী কাকচক্ষু জলে নামে—অন্যদিকে অনেক নিচে গ্রাম গড়াতে গড়াতে যায়—পর্ণকুটিরগুলি আসলে মেলার দোকানপাট এবং বামদিকে উত্তরে স্কুল। বর্তমানে মেলায় আগত অবলা শিশুদের দুগ্ধকেন্দ্র অর্থাৎ হংসশুভ্র জলদানস্থল। আরও পূবে একই সারিতে শূন্যস্থানটিতে এইমাত্র ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে নাগরদোলাটি চালু হল—তার পূবে একটি ছোট উঁচু টিলায় বধ্যভূমি, সিঁদুরচর্চিত যূপকাষ্ঠ। এই পটভূমিতে এখানে, উচেচ, আওয়াজ আসে ক্ষীণ যদিও নিচে কোলাহল এখনো নিম্নগ্রামেই আছে—কারণ পুজো আগামী কাল, মা এখনো ঘাটেই আসে নি—যদি না আসে কি বিষাদ! তাছাড়া দোকানপাট এখনো তৈরি না, কেবলই ঠক ঠক শব্দ পেরেক পোঁতার বা বাঁশ কাটার। তাছাড়া মাটির উনুনগুলো এখনো চুপচাপ আছে। কাজেই শলাপরামর্শের মতোই কলরব যেনবা গুনগুনানি মাত্র। আরও দূরে, দিঘির ঢালু পাড়ে দুবার মাত্র ব্যান্ড বেজে চুপ—ব্যাংয়ের মতো গলা ফুলিয়ে কনসর্টওলা একবার ডেকে উঠেই নিঃশ্বাস পায় নি। তাদের সার্কাসের নোংরা তাঁবু ছিঁড়ে ছিঁড়ে আকাশের গায়ে ঝুলছে এমনি মনে হয়।

সেইদিন বিকেলে পশ্চিম আকাশে ন্যাবলা ন্যাবলা মেঘ, অল্পক্ষণ পরেই একটি উত্থানের মতো—এইবা কোন্ যুদ্ধক্ষেত্রের ধূমস্তম্ভের মতো, এইবা ভালুকের মতো, নীল আকাশ গপ্ গপ্ ক'রে গেলে—কখনো বা বিশাল গজরাজ শুঁড় তোলা, আবার পরের মুহূর্তেই যেন তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ। সেইদিকে চেয়ে চিৎকার, ম্যাঘ আল্‌চে খোদা, পানি হবে ইবার—ছয়লাব হবে দুনিয়া, মাঠে 'পর' হবে—ব্যাং ডাকবে—আমরা ভিজব গ। এসব বালকবৃন্দ ভাবে। আসলে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে বর্ষণ হলে আমরা মাঠে নেমে যাবো—জমিতে ধান হবে—তোমরা ইদিক পানে এসবে না—তোমাদের গোলা ভরবে মালিক—তোমাদের দেনা শুদে বাড়ি আসবো মালিক, তা বাদে কি করবো আমাদের নিজেদেরই বিশ্বেস নাই। মুখে গামছা জড়িয়ে, বুকে হাঁটু সেঁটে এখন তো বিষ্টি চাই। মেঘটি ওজনে ভারি হয়ে অর্ধেক আকাশ গিলে ফেললে মেলার উচ্চতম স্থানটি থেকে লোমহর্ষক চিৎকার বাজে। সেই শুনে হস্তীটি চঞ্চল হয়ে একটু একটু দোলে। আকাশে সে নিজের ছায়া দেখে চঞ্চল হয়—হস্তী পক্ষ

প্রার্থনা ক'রে নিদারুণ বৃংহিত হানে। আর যখন দেরি করা যায় না—কারণ আস্তে আস্তে মেঘ পান্‌সে হয়ে আসছে, সামান্য লাল হয়ে চোখ রাঙাচ্ছে, তখন রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেতাদুটিকে আনা হয়। তাদের চামরসদৃশ লেজ ঘন ঘন সঞ্চালিত হচ্ছে—তাদের বাঁকানো শিং চক্‌চক্‌ করছে—তাদের ভুরুর উপর উত্তেজনার ভাঁজ। এই অতি তরুণ ষণ্ডদুটিকে সামনে রেখে পিছনে তারা বসে মাটির উপর উবু হয়ে। সেই উপবিষ্ট জনতার সামনে পুরোহিত তার কপাল চন্দনচর্চিত—তার পরনে গেরুয়া—তার চোখে বড়োই নিষ্ঠুরতা কারণ সেই-ই নায়ক যজ্ঞের, সেই-ই নির্বোধ ভক্তির একমাত্র অধিকারী। যুগে যুগে তাকেই মানা হয়েছে। দুটি বলিষ্ঠ যুবক এখন ষাঁড় দুটিকে লাঙলে জোতে, সে দুটি যে লাঙল কখনো দেখে নি তাই কিছুতেই বাগ মানতে চায় না। এইবার শুরু করা যায় বলে অতি ধীরে একটিমাত্র গভীর কণ্ঠ গড়িয়ে গড়িয়ে বলে যায়, সুজলা সুফলা এই বঙ্গভূমি আমরা আদ্যন্ত আনন্দে আছি—খেয়েপরে বেঁচেবর্তে সুখে আছি—আমাদের পুকুর-ভর্তি মাছ, গোয়ালভর্তি গাভী, শস্যভর্তি ফসলের কোনোদিন অভাব হয় নি। এই কারণে এই মাটির কাছে আমরা ঋণী। এই মাটির জন্যই আমাদের দরজা থেকে কখনো কোনো অতিথি ফিরে যায় নি। গরিবগুর্বো কামার-কলু, চাষী-তাঁতী, ছোটলোক হাড়ি-বাগদী-ডোম সবাই আমাদের প্রসাদ পেয়েছে। এ পর্যন্ত বলতেই উক্ত ব্যক্তির বিরাট উদর থেকে ঢক্কানিনাদের মতো এমন উদগারধ্বনি আসে যে তার চোখ মুখ কুঁচকে কথা বন্ধ হয় এবং প্রথম সারিতেই উপবিষ্ট তেঁতুলে বাগদীর দলটি এককালে উঠে দাঁড়ায়। সেই মানুষগুলির পেশি দড়ির মতো পাকানো—তাদের বুকের নিচে গভীর গহ্বর এজন্যে তারা সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন হাতে কান ঢেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে মুদিতনেত্রে সঙ্গীতের ক্ষীণ চিৎকার তুললে তার গলার শিরা দৃষ্ট হয়। সে গানে বলে, ও তুই চোখে দেখবি অন্ধকার—আবার বলে চোখে দেখবি অন্ধকার—বারবার একই কথা বললে অন্যদের চোখে কেমনধারা আগুন জ্বলে। এই ঘটনায় গোলাভর্তি ধান ও পুকুরভর্তি মাছের কাহিনী আর শেষ হতে পারে না। দলের অতি বৃদ্ধটি হাত তুলে গান থামিয়ে বলে, তু মদ খেঁয়েছিস গ—অত্যান্ত মদ খেঁয়েছিস। ইটি তোর উচিত লয়। বাবু ভাইদের কতার মধ্যে গানের কোনো কতা নাই। তা তু মদ খেঁয়ে এই কাণ্ডটি করলি বটে। অন্যেরা বলে, উ মদ খেঁলে সত্যি কতা বলে—এইটি উয়ার দোষ—তেবু মোদো মাতালের কতা বাপু উতে কান দিলে ধম্ম থাকে না। কিন্তু তাতেও আর দুধভাতের গল্প জমে না—বক্তা তার শালগমের

মতো ন্যাড়া মাথা পুনঃ পুনঃ চুলকোয়। তখন বৃদ্ধিটিই আবার বলে, ঠাকুর মশাইয়ের কাছে গড় কর তু—নমো কর—ই কথা কি তু জানিসনা এহ জগতে কে তুকে তরিঁয়ে দিতে পারে? সেই গায়কটি তখনও যেন তুরীয়ভাবে থাকে—কিছুই সে শোনে না—তার চোখ বন্ধ, মুখ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত—বড় সাংঘাতিক নিঃশ্বাসের ঘড় ঘড় আওয়াজ আসে—তোলপাড়, উক্ত ব্যক্তির জঠরদেশ তোলপাড়, পদদ্বয় কম্পমান। গায়কের এই ভাব দেখে বৃদ্ধ ভীষণ ক্ষিপ্ত—তীব্র গালাগালি বর্ষণ করতে থাকে, খেঁকি কুকুর জন্মিত ধাড়ী শুয়োর তুর মা—এঁটোখেকো অতি খচ্চর তু। শালো ক্যানে আমার কতা শুনিস না? এতক্ষণে অন্যদের, ঐ তেঁতুলে বাগদীর দলের চোখের আগুন নেভে। গায়ক একটিবার মাত্র ডাকে, কাকাগো! আহ্বানটি সম্পূর্ণভাবে হাওয়ায় মিশে গেলে তার চোখে মৃদু জল আসে কিন্তু জলের গনগনে আঁচ পেয়ে আগুন পুনরপি চাড়া দেয়। তখন এমন যে সেই বৃদ্ধ—যার নাম অভিরাম—অতিবৃদ্ধ এমতো যে তার মুখের ভাঁজ গণনীয় না, গলিতদন্ত সে—সে প্রাচীন মহীরুহের মতো বড়ই রহস্যময় উপকথাবহুল—সেই বৃদ্ধ এমনভাবে ক্ষান্ত হয়ে গেল যে পূর্বকথিত পুরোহিত মহাশয়ের গল্প সম্পূর্ণত মাঠে মারা যায়। ইত্যবসরে সুঠাম যুবকেরা মাঠের ঢালুতে সমবেত হয়েছে—তারা ষাঁড় দুটিকে নিয়ে হাস্যপরিহাসে মগ্ন। যুবকরা শক্ত দড়ি দিয়ে ষাঁড় দুটিকে জোয়ালে বাঁধে—শণের তীক্ষ্ণ রশি তাদের কাঁধের মাংসে কামড়ে বসে যায়—বাবলা কাঠের জোয়ালটিকে তারা খুবই অপছন্দ ক'রে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। নতুন চক্‌চকে—ফলাঅলা হলটিকে জোয়ালে আটকে দেওয়া গেলে তারা একবারমাত্র রাগত গর্জন ছাড়ে। উন্মুক্তফলা উক্ত লাঙলটি এখন দোদুল্যমান, শুধু ফলাটি মাটি স্পর্শ করে মাত্র—পাথুরে মাটিতে ঘর্ষণজনিত খড় খড় আওয়াজ ওঠে। এমন অবস্থায় ষণ্ড দুটি ভারি চঞ্চল—কোথা থেকে বা কিছু নীল মাছি তাদের উত্যক্ত করে—তারা তরুণ, অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, ভারি ব্যস্ত—হয়ত বা এইসব ভিড়, হল্লোড় চিৎকারে নিদারুণ ভীত একারণ পলায়নপর—তাতে যুবকদের পরিহাসতরল হা হা হি হি হাস্যরোল—স্থূল বিদ্রূপ।

সমস্ত দৃশ্যটি বর্তমানে পরিপাটি। দিঘির পশ্চিম পাড়ে উচ্চতম স্থানে জনতা—সেই গম্ভীর নামাবলিধারী সান্ত্বনাপরায়ণ পুরোহিত—সেই অতিরাগান্বিত জল-বিদ্যুৎ বর্ষণকারী তেঁতুলে বাগদীর দল—বর্তমানে কিয়ৎ পরিমাণে নমিত; পশ্চিমে পাড় ঢালু হয়ে নিম্নে নামে—পাড়ের শেষে আদিগন্ত অকর্ষিত ধান্যক্ষেত্র। মেঘ সকল একাকার, পশ্চিমে হিংগুল বর্ণ,

অন্যসমস্ত আকাশ ভারি থমথমে, চুপচাপ—বায়ু সম্পূর্ণত স্থির, যেনবা আতঙ্কগ্রস্ত। এইবার সমবেত যুবকদল হই হাম্মারি সহকারে হলযুক্ত ষাঁড় দুটি নিয়ে ধান্যক্ষেত্রে নামে—উৎসাহে তাদের হৃৎপিণ্ড দ্রুত ধাবিত, পা নিশপিশ, অতি ক্ষিপ্র। তাদের কণ্ঠে উচ্চ মা মা চিৎকার—আমাদের ধন দাও, বল দাও, অন্ন দাও, তাদের চিৎকারে কই হে, কোথায় তোমরা? চুপ কেন? বল, মা আমাদের অন্ন দাও, আমাদের ধান্যক্ষেত্র উর্বর করো, মা, তোমার আশীর্বাদে এই তরুণ ষাঁড় দুটি যারা এর আগে কোনো দিন লাঙল বয় নি তারা তোমারই বরপ্রাপ্ত—অত্র লাঙল যেমন যেমন ধান্যভূমি ছেদন করে বা স্পর্শ করে বা কর্ষণ করে সেই সেই জমি উর্বর হোক—সেই সেই ভূমিতে প্রভূত ফলন হোক। এই নিয়মে যাই—এই ষাঁড় দুটি নিয়ে প্রান্তরে প্রান্তরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াই, কর্ষণ করি। বলো তোমরা, এসো তোমরা। যুবকদল অতিষ্ঠে প্রতীক্ষা করে—ঠাকুরমশাই, আপনিই বা কেন এই কথা প্রচার করেন না? শিখাধারী পুরোহিত নিদারুণ ভীত—বক্তৃতার উদ্যোগ মাত্রেই বুক দুরু দুরু কাঁপে—যদিবা এখানে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়—যদিবা তেঁতুলে বাগদীর দল লম্ফে উঠে দাঁড়ায়—আর তাদের শূন্য উদর ঢক ঢক বাজে। তখন? তখন কে রক্ষা করবে তাকে? মা কি এতই জাগ্রতা! অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিস্মৃতিপরায়ণ এবং সুষুপ্তিমগ্ন অথর্ব। তবু অন্য অন্য বৎসরের কঠিন শাসনে এবং লোকাচার যে রোমকশায়িতনেত্রে পুরোহিতকে ধমকানি লাগায়, তাতে সে বারবার কেশে গলা সাফ ক'রে নিয়ে শুরু করতে যায়, এই সনে শুভ হলকর্ষণ শুরু হলো—তোমরা মাঠে নামো—তোমাদের মাটিতে যাও, তোমাদের সেবায়, তোমাদের ঘর্মে মৃত্তিকা তৃপ্ত হবে। এই আমাদের রীতি। এখন আকাশ জল দিলে বাঁচি। পবন যেন রুষ্ট না হয়—বরুণ যেন ক্ষিপ্ত না হয়ে ওঠে এই প্রার্থনা করি। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তোমরা মাঠে নামো। হল প্রস্তুত হয়েছে।

সেই স্থলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের যারা মুখে মলিন গামছা জড়িয়ে বসেছিল, তারা এই মজার দৃশ্য দেখে আর ভাবে, মায়ের কেচ্ছা ভারি আচ্ছা উমদা কেচ্ছা বটে! এ'টে উদম হ'য়ে গেলচে—প্যাটের চামড়া মাজায় সে'টে গেলচে, তেবু উয়াদের ভ্রুক্ষেপ নাই গ। আঁ, কি বেপার! পুরুত ঠাকুর পুনরূপি বলে, যাও তোমাদের মাটিতে যাও, আর কি অদ্ভুত কাণ্ড—তেঁতুলে বাগদী-দের খুনখুনে বৃদ্ধ বকবক হাসে। তাই শুনে পুরোহিত কথা থামায়—সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাগদীর দল সমস্বরে দাবি করে, ই মাটি কার? ই কি মোদের? বলো গ'—লিব্বাক হবে না খবরদার। কোন্ মাঠে যাবো মোরা?

মুখে গামছাজড়ানো দল মনে মনে ভাবে, ই মাটি তুমাদের। আমাদেরও বটে। তবে উয়ার ভ্যাতরে যাবার লেগে। কবর-লাগ হবার লেগে। ভাবনাতেই তাণ্ডব, নৃত্য আর সংগীত শুরু হয়ে যায়। রই রই চিৎকারধ্বনি, কথা বলো ঠাকুর মোশাই, আমাদের বাপের গুরু, তুমার বৌ কি ন্যাংটো হ'য়েচে কখুনো—ক্ষিদেতে মাটি খে'য়েছে হে—রেতের কালে প্যাট বাজালছ ঢোলের মতুন ববম্ ববম্? বলো, ই মাটি তুমার বাপের কিনা? কি যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য নেমে আসে—সেই খোলা রুক্ষভূমি সামনে থাকে—ঢেউয়ের মতো এসে আঘাত ক'রে ফিরে যায় ক্ষুধার গর্জন। আওয়াজ পুনরপি ভয়ঙ্কর বীভৎস—কারণ উক্ত আওয়াজে বহুকণ্ঠের একত্রাবস্থা এবং এই প্রকার দাবি—ই মাটি কার, ই মাটি কার—বারবার মিশ্রিত, আরো, এই প্রকার বাক্যসমূহের মধ্যে কখনো কখনো নিস্তব্ধতা, অথবা বিকট হাস্য, স্থূল অঙ্গভঙ্গি ও ঊরু প্রদর্শন বা তালমানহীন হিংস্র নৃত্য। ঠাকুরমোশাইকে উল্টিয়ে দে—উয়াকে চিৎ করে দাও গো, কাছিমটোকে চিৎ করে দাও হে ধরনের বাক্যাবলিও উপছে উপছে মাঠের দিকে যায়। অবশ্যই এমনি নিষ্ঠুর প্রস্তাবসকল কিছুটা নিম্নগ্রামের এবং মুখমণ্ডলে গামছাজড়ানো সম্প্রদায়ের মন্তাজই এই ব্যাপারে অগ্রণী—কারণ তেঁতুলে বাগদীর দলটি কিছুটা স্তম্ভিত এবং চকিত ও বিভ্রান্ত ছিল। তবু তারা যেনবা মিছিলে যাবে এমনিই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং মন্তাজের বিদ্রূপরত ক্রুদ্ধ দলটিও তাদের পিছনে। অতএব সমস্ত আয়োজনই বুঝিবা নস্যাৎ। অদূরে লাঙলজোড়া ষাঁড় দুটির পাশে ভূম্যধিকারী গ্রামীণ যুবকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়—তাদের দোদুল্যচিত্ততা প্রায় ভীতির পর্যায়ে গেছে। হঠাৎ ষাঁড় দুটি ক্ষিপ্ত বেগে কোনো অমিততেজে অনুপ্রাণিত হয়েই যেন দিঘির ঢালুপাড় বেয়ে নিম্নে নামে এবং লেঙ্গুর তুলে প্রান্তরের দিকে দ্রুত ধাবমান—তখন কেবল তখনই একটি ভাঙন দেখা যায়—অধিকন্তু আকাশ গরর গরর শব্দে যে মেঘস্বর প্রেরণ করে তাতে হিরণপুরী মহিষের শিংতোলা মেদুর গর্জন প্রতিধ্বনিত। এজন্যেই গ্রামীণ যুবকেরা আর স্থির থাকতে পারে না—তারা উচ্চ চিৎকারে মায়ের জয় ঘোষণাপূর্বক ষাঁড় দুটির পিছনে পিছনে মাঠে নেমে গেলে সিঁদুর বর্ণের আকাশ থেকে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হয়। এই ব্যাপারটি তেঁতুলে বাগদীদের দলটির মত্ততাকামী রক্তে এমন একটি জ্বালা ধরিয়ে দেয় যে তারা ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়; এতক্ষণ যে নিদারুণ বিক্ষোভের আগুন তা'দের তাতিয়ে তুলেছিল এবং তারা সকলে মিলে একটিমাত্র উপলব্ধিতে অভিন্ন হয়েছিল ও তাদের প্রত্যেকের রক্ত মাংস অস্থি

মজ্জা হাড় একত্রিত হয়ে আকাশচুম্বি এক পুরুষের জন্ম দিয়েছিল, সেই রাগী বিশাল পুরুষটিই ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তারাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঠে নেমে গেল। যদিও গভীর ক্লান্তি বৃদ্ধ অভিরামের গায়ক ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহরকে ছেড়ে গেল না—কিংবা হতে পারে তার গান তাকে যে ভীষণ তিতি-বিরক্তি এনে দিয়েছিল তাতে সে নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে নিজের মাংস নিজেই খাবার চেষ্টা করছিল এবং যদিও নব্বুই পেরিয়ে যাওয়া অভিরাম বর্তমানে হাঁটু দুটি কাঁধ পার ক'রে মাথাটির দুপাশে দুটি লাঠির মতো খাড়া রেখে চুপচাপ বসেছিল—তবু উক্ত তেঁতুলে বাগদীদের দলের অনেক অনেক যুবক কিশোর প্রৌঢ় হলকর্ষণের উৎসবে যোগ দিয়েছিল। তারা হা রা রা চিৎকারে ষাঁড় দুটিকে বিদ্রূপ করত বিশাল মাঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। এসব দেখে শুনে মন্তাজের দল আর কিই বা করতে পারে? তারা কয়েক দমকে হ্যা হ্যা হাসি হেসেছিল। যখন মান্যবর পুরুত ঠাকুর বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলোতে বুলোতে ঈষৎ হতভম্ব এবং মানে মানে ভাগবেন কিনা চিন্তা করেন তখন অনেক দূরে লাঙল জোড়া ষাঁড় দুটি শূন্যে লাফাচ্ছিল এবং তাদের পিছনে, পাশে, সামনে ছড়ানো মানুষগুলিকে খুবই ক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল। এই দলটির পায়ের চাপে ধানের নাড়াসকল মুড় মুড় ক'রে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের গায়ে লেগে-থাকা অল্পবিস্তর ধূলি কিছুটা উপরে উঠে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎই হয়—সূর্য অস্তমিত হলে আকাশের হিঙুল বর্ণ বিবর্ণ, বর্ষার ঘোলা জলের মতো, বা কালো ভারি পর্দার কাছাকাছি—অতঃপর বিকট গর্জন পশ্চিম আকাশে—অদ্ভুত, অকেজো মন্ত্রপূত লাঙলটির পশ্চাদ্ধাবনরত মানুষগুলির মাথার উপর এবং ঐ স্থান থেকে দৃষ্ট হয় দিঘির পূর্বপাড়ে বটবৃক্ষের ছায়াময় আঁধারের গায়ে আবছা ভেসেওঠা গজরাজের অবিশ্বাস্য মূর্তি—যেন গলে গলে যায়বা—শুধু তার শুণ্ডটি মরজাগতিক আগ্রহে বৃংহিত সহকারে পুনঃ পুনঃ শূন্যে আন্দোলিত। হস্তীর উক্ত অঙ্গ সঞ্চালন কি নৃত্যের মুদ্রা? এবং সেই বিশাল প্রাণীর আগ্রহ, প্রার্থনার প্রভাবেই কি এই বৈশাখের শেষদিনে প্রদোষের ম্লান আলোয় ক্ষিপ্ত বৃষ্টি নামল?

এইখানে এসে গ্রামরেখা দিগন্তের কাছে কয়লার গাদা সদৃশ—এবড়ো খেবড়ো, সম্পূর্ণ স্তব্ধ—বুকে ভয় জাগিয়ে তোলা। প্রান্তরের মাঝখানে নতুন কাটা পুষ্করিণী উচ্চ লাল পাড়। সেখানে অন্ধকারে লুকিয়ে-থাকা নবীন লক্‌লকে জাম গাছটির গায়ে জোয়ালটি খটাখট শব্দে আটকে গেলে

ষাঁড় দুটি লেজ তুলে প্রবল বেগে টানে এবং তাদের চোখের কোণে রক্ত দেখা দেয়। এই পরাক্রমে জাম গাছটি থর থর ক'রে কাঁপতে থাকলে ভূম্যাধিকারী আধাবাবু যুবকের দল ঘর্মাক্ত কলেবরে, সঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সেখানে এসে উপস্থিত হয়—তাদের আশেপাশে ক্ষুধার্ত ছোঁক্ ছোঁক্ শিকারী কুকুরের মতো তেঁতুলে বাগদীর দলটিও এসে হাজির হয়। এই দলটি চারিদিকে ছোট ছোট বৃত্তে পরিক্রমণ করে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ছাড়ে এবং চামড়ার উপর দরবিগলিত স্বেদ সহ সকলেই বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। ষাঁড় দুটি গাছ উপড়ানোর চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ক্রুদ্ধ গোখরোর মতো গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকলে একটি যুবক তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, শালারা গাছটা উপড়িয়ে ফেলবে মনে হচ্ছে—তবু ভাল বিষ্টিটা ঠিক সময়েই এয়েচে। নইলে অমঙ্গল হোত। তাই নয়রে ঘণ্টা? ঘণ্টা দু-হাত নেড়ে রাত্রির মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে বলে, কি বলবো মাইরি—ভয়ে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছিলো—এই তো আকাশের এ্যাল্লা—কোথা হাল লাঙলের দিনে রিগিরি দিয়ে বিষ্টি হবে, তা নয়...ই দিকে এই শালার বাগদীগুলো ইল্লোতি মারছিলো।

এ্যাই-ও, খবরদার—ভয়ানক আক্রোশবাক্যটির চেয়ে বহুগুণ উচ্চ একটি মেঘগর্জন একই কালে ধ্বনিত হয়ে উঠলে উক্ত কথাগুলি শোনা গেল না—কিন্তু তেঁতুলে বাগদীর দলটি একবারও বিশ্রাম না নিয়ে শুধুই অস্থির পাক খায়। তাদের মধ্যে কেউ হঠাৎ নিচু হয়ে পড়পড়িয়ে ধানের নাড়া তুলে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখে। আরেকটি যুবক বলল, আচ্ছা, এই বাগদীগুলো এ্যামোন এ্যারকি মজাচ্ছিলো কেন? ওদের সঙ্গে আবার কটা ভাইসাহেব জুটেছে।

দাঁড়া শুধুই ওদের। হাঁরে ঐঃ র‍্যাঙা—র‍্যাঙা—জোর চিৎকারে আবছা আঁধারে তালগাছের মতো একটি মূর্তি বলে, ক্যানে গ, কি বুলছ? ইদিকে আয়তো—ঐঃ শোন, ই দিকে শোন।

মূর্তিটি নিশুতির ল্যাম্পপোস্টের মতোই ভূতুড়ে—দুটি শীর্ণ হাতে বাতাস আঁচড়াতে আঁচড়াতে এগিয়ে আসে এবং ভারি বর্ষণের দরুণ অন্ধ হয়ে অন্য দিকে যায়—যুবকদের একজন বলে, কি মালই টেনেছ বাবা—শালা চোখে পেলয় দেখছে।

ওদের রকমই এই—ভাত উগ্‌রে মদ গিলবে।

ভাত কতো? ও শালাদের এখন ভাতের শান্‌কিতে মুত। নিজেদেরই মুত। ঘণ্টা নামের যুবকটি আরও বলে, তাই খেয়ে বাগদীদের মেয়েগুলোর

রকম দেখে আসিস্।

তুই বুঝি মাঝে মাঝে গিয়ে চেখে আসিস্, নয়?

মাংসের ব্যাপার গো—মাংস সব সময়ই এক রকম।

তা বলছি না—ঐযে ঐ শান্‌কিতে কি যেন বললি!

আধাবাবু আয়েসি যুবকগুলি ঘোররবে হেসে ওঠে। ইত্যবসরে সবটুকু আলো চলে যায়, এতক্ষণের বৃষ্টিতেও মাঠে জল দাঁড়ায় নি, উপরন্তু ভীষণ গরম ভাপ ছাড়ছে মাটি, কয়লার গন্‌গনে আগুনের উনানে জল ঢালার মতো—কিন্তু আকাশ চরম গোঁয়ার, একটানা বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আরও ঘন ও দ্রুত হয় এবং অন্ধকারে গভীর শব্দে বাজে। আরও একবার মায়ের জয় ঘোষণা ক'রে যুবকরা উঠে দাঁড়ায় এবং তখুনি তীব্র আতঙ্কে তারা তেঁতুলেদের দলটিকে আশেপাশে খুঁজতে থাকে। কিন্তু তারা সেখানে ছিল না—জলের বাতাসে কোনোরকম গন্ধ নেই, বৃষ্টি একমনে হয়ে যাচ্ছিল—দু-একবার বিদ্যুৎ চমকায় নি বা মেঘও ডেকে ওঠে নি—শুধু বাতাসের ঝাপট আসছিল ; এরই মধ্যে বাগদীদের অত বড় দলটি কোন্‌দিকে আত্মগোপন ক'রে আছে এই কথাটা কোনো একজন শব্দে বলে, ব্যাটারা কোন্‌দিকে গা ঢাকা দিল দেখো দিনি! ব্যাপারটা এইরকম যে ওদের সঙ্গে না নিয়ে, পিছনে বা অন্ধকারে রেখে কোন্ সাহসে এগিয়ে যাওয়া যায়! অনেকটা তফাতে নজর পড়লে তারা হঠাৎ দেখে নেংটি পরা মানুষের দলটি একটি আ আ চিৎকারে কিভাবে যেন বাতাস কাঁপিয়ে দেয়—পুরো একটি শুয়োরের পালের মতো—কিছু তাদের খুঁজে পেতেই হবে। এতে কিভাবে সামান্য আশ্বস্ত হয়ে যুবকদের একজন চিৎকার ক'রে ওদের ডাকে, আয়রে, দক্ষিণ মাঠ সারি—এই বলে পাঁচ-সাতজনে ঠেলাঠেলি ক'রে জামগাছ থেকে জোয়ালটি মুক্ত ক'রে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ষাঁড় দুটির পেছনে পাঁচন মারে। টকবগ ক'রে ফুটে উঠে তারা আবার উদ্‌ভ্রান্তের দৌড় লাগায়—এতে লাঙলের ফলাটি কখনো কোনো জমি ছেদন করছিল, কোনো জমি স্পর্শ ক'রে যাচ্ছিল—কোনো উঁচু আলে আটকে গিয়ে তাদের গলরজ্জুতে ভীষণ টান পড়ছিল এবং তাদের আকার ছোট হয়ে গিয়ে তারা পিছিয়ে আসছিল। আবার ও দৌড়াচ্ছিল—মায়িকী জয়—মায়িকী জয় এমন সব অবাস্তব চিৎকার ক'রে হুড়মুড় হুলস্থুল চৌদিকে ছোটাছুটিতে বিভ্রান্ত—ঐক্য বিনষ্ট—শৃঙ্খলা ভেস্তে যায়। একটি মাত্র লক্ষ্যবস্তুর জন্যে হারিয়ে যাবার হাত থেকে তারা নিস্তার পায়—যে জন্যে অন্ধকার, হাওয়া, বৃষ্টি দিকহীন সমতল মাঠ ইত্যাদি সত্ত্বেও তারা লাঙলজোতা ষণ্ড দুটির কাছে

ফিরে ফিরে আসে। এই সঙ্গেই বৃষ্টি কমে কমে এখন টিপটিপ, হাওয়াটি সাঁতলা, মাটিটি নরম বিধায় উৎসাহপ্রদ—যেনবা তেজবর্ধক, উপরন্তু একটি অতিমিষ্টি ভেজামাটির সুগন্ধও আসছিল। এতে ষাঁড় দুটি নতুন উদ্যমে উন্মত্তপ্রায়, তাদের সবল লিকলিকে কেঠো কেঠো পা-গুলি প্রায়শই শূন্যে। এটিও যুবকবৃন্দের কাছে খুবই আনন্দদায়ক, কারণ এর মধ্যে মায়েরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং বিশ্বাস তাতে মঙ্গল অবধারিত। এখন শত চেষ্টাতেও ষণ্ড দুটির নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের আশীর্বাদে তারা কি তীব্র গতিতে দোঁড়ায়—যেন এখানে অনেকানেক বর্গমাইলব্যাপী চতুর্দিকের যাবতীয় কৃষিক্ষেত্র তারা স্পর্শ করবে, পরিক্রমণ করবে, তাদের হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকরো হলেও তারা বিরত হবে না। দূরে তেরছাভাবে ওরা কেবলই লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে—যুবকদল তাদের নিকটস্থ হবার সূচনাতেই তারা মৃদু আনন্দে শব্দ ক'রে আরও দূরে যায়—এথায় ভূম্যধিকারী যুবকেরা খুশিতে বাগ্‌বাগ্‌—তেঁতুলেদের কুচক্র বিস্মৃত, পরস্পরকে বিস্মৃত তারা আপন আপন খুশমেজাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে উৎসাহে আশায় কে কোন্‌দিকে ছিটিয়ে যায়। তারা প্রত্যেকই স্বেদগন্ধি, জামাকাপড় ভিজে সপ্‌সপ্‌, শরীর কর্দমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী—মাঠে মাঠে আকুল পদচারণা যেনবা স্পন্দিত! বিরাট এলাকা জুড়ে তারা কে কোথায়—মাঠ তাদের গিলে ফেলেছে, তাদের অতিদ্রুত অঙ্গচালনাও হাস্যকর মনে হয়—সর্পধৃত ইঁদুরের ঠ্যাং নাড়ানোর মতোই বিষণ্ণ। কিন্তু উন্মত্ততার দৃশ্য সত্যিই সুসমাপ্ত। এই ব্যাপারটিই যুবকদলের কল্পনায় ছিল—গ্রাম্যভাষায় একেই বলা হয় অবস্থা মাঠে মাঠে বা ডালে চালে মিশ্রিত অর্থাৎ শুভ হলকর্ষণ খুবই বিস্তৃত হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন শুধু ব্যাপক বৃষ্টির প্রতীক্ষা—তারপর যতদূর চোখ যায় ফলন্ত ধান্যক্ষেত্র। এই চিন্তায় যুবকদের বুক ফুলে ওঠে। গোলাগুলি এখনই বা পূর্ণ হয়ে এসেছে!

সামান্য বিশ্রামের জন্যে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে প্রতুল নামী যুবকটির উক্তি, হারামজাদা বাগদীগুনো আবার অন্ধকারে হারিয়ে গালো—

প্রত্যুত্তরে ঘণ্টাই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, ও শালাদের একটারও বাপের ঠিক নাই—বুয়েচ?

তাতো বোঝলাম—তা এই শালারাই যদি তোর জমিতে হাত না দেয় কি করছিস? আমরা তো ঠুঁটো জগন্নাথরে—আঁ?

জমি করবে না তো খাবে কি?

কতো দিচ্ছিস খেতে? গরু যে গরু—সেও তো দুবেলা দোনা থেকে

খড়টা খেতে পায়!

ঐ তেঁতুলেদের কথা আর বলো না পিতুলদা, বুয়েচ, মদো মাতালের জাত, মদেতেই সন্তুষ্টি—সব বিচে কিনে মদ মারবে। ও শালাদের মাথায় পা দিয়ে দাবিয়ে রাখার পেয়োজন। বুঝলে না?

বকাসনে ঘণ্টা—মেলামারি বকাস্‌নে।

সেই মুহূর্ত থেকে আবার দৌড়—কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত কারণ পঞ্চাশগজ দূরে ষাঁড় দুটি জবুথবু, বোকা—দীর্ঘ টানা টানা নিঃশ্বাস—যেন ক্রন্দনপরায়ণ এবং যুবকদল নিকটে গিয়েই অতি উচ্চস্বরে হায় হায় শব্দে টলটলায়মান, ন্যাকা। সঘন নিঃশ্বাস কি ভয়ঙ্কর কর্ণবিদারী; এস্থলে নিঃশ্বাসই যে যন্ত্রণা! হায় কি নিদারুণ সর্বনাশ—যুবকদল অস্ফুটে বলে, কারণ লাঙলের উন্মুক্ত চক্‌চকে ক্রুদ্ধ ফলাটি একটি পশুর পিছনের পায়ে বল্লমবৎ গেঁথে গিয়েছিল। তরুণ জানোয়ারটি সেই পা-টি খানিকটা পিছিয়ে দিয়ে মোয়েনজোদারোর পৃথিবীখ্যাত তাম্রফলকে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছিল তৈলশিলার খনিজ তৈলের মতো। এই শোণিত আদিতে অসহ্য লাল, মধ্যে অনিঃশেষ ও বেগবান এবং অন্তে কাল্‌চে ও দ্রুত জমাট। যুবকদল ষাঁড় দুটিকে ঘিরে দাঁড়ালে সেই বৃত্তে প্রান্তরের বায়ুতাড়িত আঁধি প্রবেশ করতে থাকে। এবং এর মধ্যে সামান্য অঙ্গ চালনা, টুকরো সংলাপ ইত্যাদি দৃষ্ট ও শ্রুত হবার সম্ভাবনা ছিল।

খুবই অলুক্ষণে কাণ্ড হয়ে গালো—

ফালটা কেমন ভুঁকিয়েছে দ্যাখোদিনি—

শালারা দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য—

এখন মোচনদের ভোগে নেগে যাবে।

খবরদার ঘণ্টা—মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবো তোর, ওই কথা আর একবার বলে দ্যাখ্।

কেন, কি অন্যায়টা বল্লাম।

আরেকবার বলে দ্যাখ্।

বল্লে করবি কিরে তুই?

ওরে শালার আগুরি—একবার বলে দ্যাখ্ না তুই।

এই বলে সেই যুবকটি, তার নাম অধীর, এমনিই তীব্র নরঘাতী আক্রোশে এগিয়ে আসে যে ঘণ্টা শুধুই বিড়বিড় করে। এমতাবস্থায় নায়ক প্রতুল বিশাল প্রান্তরের শ্রুতিগ্রাহ্য ক'রে বলে, এ্যাই, ফচ্‌কোমো মারা পেইচিস্—সব জায়গায় ফচ্‌কোমো। ফালটা ছাড়িয়ে দিতে হবে না—এ্যাঁ।

কয়েকজনে মিলে ষাঁড় দুটির সামনে গিয়ে জোয়ালটি চেপে ধরলে, লাঙলের ফলাটি ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকে। ষণ্ডটি যন্ত্রণায় পাগল, তার বৃহৎ মুণ্ডটির একটিমাত্র আন্দোলনে যুবকদল দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

এইভাবেই শুভ হলকর্ষণের মহোৎসব ছিঁড়ে ফেটে টেঁসে যায়। ক্লান্ত ষাঁড় দুটি মাথা নামিয়ে ফেরার পথে। এসময় যদিও রাত্রি প্রথম প্রহর মাত্র—কিন্তু প্রসারিত মাঠে তেপান্তর, অপরিচয়, রহস্যময়তা ঘনীভূত এবং যেনবা মধ্যরজনীর ঘোর নিনাদ কর্ণপটহ ফাটিয়ে দেবে? এক শ্রেণীর খড় রঙ ঝিঁ ঝিঁ পক্ষ ঘর্ষণে উৎকট রী রী আওয়াজ তুলছিল এবং কিছু কিছু জোনাকি কাঁটাঝোপে টিপটিপ জ্বলছিল বৃষ্টি পেয়ে ক্ষুদ্র ব্যাঙগুলি বেরিয়েছে, জলাভূমিতে আগুন দপ দপিয়ে উঠে গড়িয়ে যায়—ছোটখাটো নাদুসনুদুস খরগোসের আকারের মেঠো ইঁদুরগুলি ধানের নাড়ার আড়ালে আড়ালে দৌড়োয়। উপরন্তু দু-একটি খেঁকশিয়াল খ্যা খ্যা শব্দে এমন খেলো হাসি দেয় যা স্পষ্টতই স্নায়ুমণ্ডলিকে বিচ্ছিরিভাবে শিরশিরিয়ে দিচ্ছিল।

এর পর থেকে গাঁ গুলি অনবরত মুছে যাচ্ছিল এইজন্যে যে সূর্যাস্ত থেকে রাত যতই দূরে যায় তত শাদা হয় এবং সেকারণ, কিছুটা হরিয়ে যায় বা চোখের আড়ালে যায়। রতনপুর, ট্যাঁকসোনা, ঢেঁড়িয়া, ঠ্যাঙাগড় ইত্যাদি ঘাড় ঝুঁকিয়ে ঝিমোয় এবং যুবকদল অনতিবিলম্বেই রতনপুর যাবার পথে টাঁকসোন বা ট্যাঁকসোনায় প্রবেশ করে। শুকনো এলোপাথারি বাবলা গাছের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে পটাপট্ পায়ে কাঁটা ফোঁটে। পথের আশেপাশেই তারা মুখিয়েছিল। তাদের এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না। শেষে পগাড় ছাড়িয়ে আসতেই শাদা রাত ফুরিয়ে এল। কুঁড়েগুলি দেখা দিতে শুরু করেছিল এবং অল্পসল্প আলো। আলো বদখত, ভয়ানক—প্রায় শ্মশানসম যদিও শ্মশানে মৃত হলেও মানুষী দুর্গন্ধবাহী বায়ু থাকে এবং গলাপচা মৃতদেহ ভক্ষণরত শৃগালের চোখ চকচকায়। সেও তো প্রাণী বটে—নরবসার গন্ধ,সেও তো প্রবল বটে; করোটিতে বাতাস বেধে লোমহর্ষক বাঁশি বাজে, তবু তাও শব্দ। কিন্তু এই গ্রাম গন্ধহীন, শব্দহীন, বায়ুহীন শূন্যতা—ধুলোভর্তি পথে কোনো মানুষ নেই—কোনো কুঁড়েতে মানুষের কণ্ঠ বাজছে না; চণ্ডীতলা, বৈঠকখানা ও দহ্লিজ সম্পূর্ণত শূন্য এবং সমস্ত আলো আগ্রাসী অন্ধকারেই সংগত। দারুণ অস্বস্তিতে যুবারা দ্রুত পথ অতিক্রমের চেষ্টা করে। তারা প্রায় এই বিভীষিকার এলাকা ছাড়িয়ে আসতে পেরেছিল, এই সময় তাদের পথটি আটকে যায়।

ধুলো কেটে কেটে একটি শীর্ণ জলধারা আসছিল—প্রধান ধারাটি থেকে আরও সরু সরু জলরেখা ধুলোর ভিতরে গিয়ে অদূরে শুকিয়ে গেছে। স্পষ্টতই এইসব ব্যাপার নবসৃষ্ট—কারণ নিকটেই একটি কুঁড়ে ছিল এবং তার চারিপাশ খোলা এবং পথটিই তার উঠান—এমন অবস্থায় কুঁড়ের দাওয়ায় কলসি কলসি জল ঢাললে পথেই জল আসবে বিচিত্র কিছুই না। যুবারা অন্যমনস্কে চলতে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে পা দেয়, চমকে ওঠে এবং পুরো দৃশ্যটাই দেখে ফেলে। সেখানে কুঁড়েটির দাওয়ায় অনেকগুলি লোক—এইটিই বিসদৃশ, এই মানুষের দেখা পাওয়া যাদের হাত-পা চোখ-মুখ ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে। এইসব মানুষ কারা যুবারা ভীত হয়ে ভাবে এবং তারা কোনো কথা বলছে না বা শব্দ করছে না। বাতাস যদি এবং যখন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, কেরোসিনের লম্ফটির শিখা স্থির হয়ে জ্বলে, তখন একটি অশক্ত ভৌতিক চিঁ চিঁ আওয়াজ একটানা শ্রুত হতে পারে—এই বিশেষ আওয়াজটি বাদ দিলে মানুষগুলি নিঃশব্দে কাজ ক'রে যাচ্ছিল। তাদের কেউ কলসি ক'রে জল আনে—কেউ লম্ফটি উঁচু ক'রে ধরে ছায়াগুলিকে বিকট ও কম্পমান ক'রে দেয়—তবে চার-পাঁচজন মিলে নিচু হয়ে কোনো একটি আদরের বস্তুকে বার বার ধুয়ে ফেলছিল। এদের প্রায় সকলের মুখেই ময়লা গামছা জড়ানো ছিল।

অধীর প্রতুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর প্রতুল শোনে, মড়া—না পিতুল?

তাইতো মনে হচ্ছে।

কতো যত্ন দেখেছো—ঠিক যেন বিয়ের বর সাজাচ্ছে মাইরি।

প্রতুলের নিঃশ্বাসের সাঁই সাঁই আওয়াজ শোনা গেল, বোঝলাম, মোচনদের এই কাজটা বেশ। আমাদের শালা মড়া কেউ ছোঁবে না—বউও দূরে বসে ভ্যাবাবে—শেষে চ্যাটাই মুড়ে শ্মশানে নিয়ে দূরদার ঠেঙিয়ে পোড়াবে। ধুঃ শালা।

আসলেই সেটি একটি তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরের মৃতদেহ ছিল। সেটিকেই উল্টে পাল্টে ধোয়া চলছিল। মৃত কিশোরটি সোজা ন্যাংটা—একারণ তার হাঁটু, কুঁচ্‌কি, বগল ও অন্যান্য ভাঁজের জায়গাগুলিতে কোঁচকানো চামড়া দৃশ্যমান। বস্তুত মরা চামচিকে বা শুকিয়ে অক্কা পাওয়া বাঁদর ছানার সঙ্গেই মৃতদেহটির মিল ছিল বেশি।

শান্তি বা সুস্থিরতা কোনোটিই আদৌ বিঘ্নিত হয় নি। শুধু কিছুক্ষণ পরে, সম্ভবত ধোয়ামোছার কাজটি সমাধা হয়ে গেলে অকস্মাৎ

অপরিচিত ভাষায় ঈশ্বর সংক্রান্ত গূঢ় কথা হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে আসে। একটি মাত্র সুইচ টিপে দিলে কোনো কোনো বিশাল বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র যেভাবে বিনাভূমিকায় চালু হয়ে যায় অনেকটা সেই রকম। এবং এই শুরুর পর থেকেই সবকিছু ভয়াবহ মানবিক—যথা হৃদয় ছেঁড়া বাঙলা কথা—আঃ আঃ জান্তব ধ্বনিও মানুষী হয়ে ফেটে পড়বে। শুদু না খেঁয়ে মলোরে—ই কি চোখে দেখা যায় বাপ—এই বাক্যটি কিন্তু একটি অনাহারী খাটুয়ে মর্মান্তিক বিলাপ—যে বালকটির আত্মীয় নয় আদৌ, শুধু এইটুকু যে তার কথায় প্রত্যাশাভঙ্গ-জনিত হতাশা ছিল যে কিশোরটি যুবক, জোয়ান এবং আঁটোসাটো বলদের মতো মজবুত হতো—সেই চমৎকার পরিণতিকে মাঝামাঝি হাঁটু চালিয়ে মটাৎ ক'রে ভেঙে দেওয়া হল। তারপর ধরা যাক একটি বুড়ির কম্পিত ক্রন্দন, আমার সোনা, ক্যানে তু দুনিয়া ছেড়ে গেলি—আর আমি মলোম না—এটি খুবই সাধারণ অভিযোগ, অর্থহীন প্রায়—শুধু বুড়িটির কণ্ঠটি ছাড়া—কিন্তু অন্য একটি স্ত্রীলোক বিনিয়ে বিনিয়ে বলছিল, তিনদিন বাপ আমার কিছুই খায় নায় গ—ক্যার বাড়ি গেয়ে আমি কি মেগে আনব গ, দ্যাশেই যখন অকাল আল্‌চে—পোড়া দ্যাশ জ্বলে গেল বাপরে আমার—এইভাবে আধা গদ্যে আধা পদ্যে বলতে বলতে শেষে সম্পূর্ণ গদ্যে বয়ান ক'রে যায়, কটো খুদ ছিলো—তাই রেঁদে দেলোম কাল রেতে। তাই খেয়ে বল হলছিলো বোধায় শরীলে এট্টু—দোপোরে গেঁইছিলো হাতি দেখতে —বেঁহুস ছেলেকে নিয়ে এলো নোকে—তা বাদে—

এসবই নিষ্প্রয়োজন যতক্ষণ পর্যন্ত না মোক্ষম কথাটি ছাড়া হল, নির্বিকার নিষ্ঠুর কণ্ঠটি শুধু শ্রুতিযোগ্য, দাঁড়া, দাঁড়া অতো লাপাইচিস ক্যানে, বেপার অতো সোজা লয়কো—সব কটোকে মরতে হবে এঁটে তুলে—দুদিন সবুর। ইঃ, সব এ্যাকবারে বোগল বাজিয়ে কাঁনচে যেন শালোরা সব বেঁচে থাকবে!

ঝটিতি সবই নিস্তব্ধ হয়েছিল, তবে শুধুমাত্র অনবচ্ছিন্ন চিঁচি ক্রন্দনসম আওয়াজটি নিস্তব্ধতাকে শানিয়ে তোলে বা ঝলকিত করে যেজন্য যুবাদল পুনরপি নিদারুণ সন্ত্রস্ত এবং ইতিমধ্যে কেরোসিনের লম্ফটির শিখা ভয়ানক বাত্যাতাড়িত, সেহেতু ছায়াসকল আন্দোলিত ও এখন তখন অন্ধকারে মিশ্রিত। এভাবে ক্ষণকালমাত্র অতিবাহিত হলে উঠোনের সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে—তখন তাদের মুখে গামছা এবং পরনে নেংটি মাত্র নজরে আসে—ধর্মত তাদের শরীরও দেখা যায় এইভাবে যে তারা প্রায় পোড়া কাঠের মতো কালো, বিশীর্ণ এবড়ো খেবড়ো বা কতকটা কোল-কুঁজো অর্থাৎ

সোজা কথায় এরা সবাই ভুতুড়ে, বেশ কিছুটা ছায়াময় প্রেতবৎ। তাদের কেউ কেউ অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে—কেউ কোনো চুলকানির উপশমে ব্যস্ত—তবে প্রত্যেকেই চুপচাপ—একটু আগে যে নির্দয় ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত হয়েছে—যেনবা সেটি নিয়েই মশগুল। বিলুপ্তির ভাবনাতেই যেন বিলুপ্তি নিরোধ হতে পারে।

নতুন বাঁশের খাটিয়ায় শবটিকে শোয়ানো হয় ধীরে ধীরে বিশেষ যত্নের সংগে এবং এই খাটিয়াটি সামনে রেখে যে প্রার্থনার অনুষ্ঠানটি হয় তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনিই অর্ধমনস্ক দায়সারা গোছের। কিছু কিছু গম্ভীর বাক্যাবলি এবং অল্প পরেই দুহাত তুলে সকলে মিলে কিছু কিছু বাসনা প্রকাশান্তে অনুষ্ঠানটির ইতি টেনে দেয়। তারপর খুবই নিয়মানুবর্তিতার সংগে ছোট্ট মিছিলটি সঙ্ঘবদ্ধ হয়। খবরের কাগজের ভাষায় এই মিছিলটিকে অনায়াসেই একটি ভুখা মিছিল বলে বর্ণনা করা যেত কিন্তু আসলে তা তো নয়—এরা সবাই ছিল শবানুগামী। দল সারিবদ্ধভাবে রাস্তায় এসে পড়লে দুটি-একটি গগনবিদারী চিৎকারধ্বনি ওঠে বটে—কিন্তু কিছুতেই বিশেষ জোরালো হয়ে উঠতে পারে না—অতঃপর গুবরে পোকার মতো এই চিৎকার নির্বোধ বৃত্তাকার—ঝড়ো বাতাসের মতো হাহাকার ভরা নয়—তবে ভয়ঙ্কর শূন্য! এই শূন্যতার কোনো তুলনা ছিল না—গোপন ঘূর্ণির মতো রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই-ই একমাত্র তুলনা বা অনুভব যাই-ই বলা যাক না!

মিছিলটি যখন যুবকগুলির কাছাকাছি আসে—তারা সামান্য চেষ্টায় একটু পাশে গিয়ে গা ঢাকা দিতে পারে—কেই-ই বা দেখে তাদের? এইভাবে তারা পার হয়ে গেলে এবং ধোঁয়াটে আঁধারে মিলিয়ে যেতে থাকলে অধীর এগিয়ে এসে দ্রুত ‘স্থানত্যাগের পরামর্শ দেয়। একরকম এলোমেলোভাবে সে বলে যে সে হঠাৎ কিছু আগুন দেখেছে—যেটি জ্বলে উঠল বলে। কাজেই সময় থাকতে কেটে পড়া প্রয়োজন।

তাদের মধ্যে একজন সঠিক মন্তব্যটি করে, ক্ষিদেয় ক্ষিদেয় বেটাদের চেহারা আর মানুষের নাই—কি বলো পিতুল? কাজকম্মো নাই তো!

কাজটা করবে কোতা? তোমার ইয়েতে? এই লোকটি বিশ্রী অমুদ্রিতব্য দুর্বাক্য উচ্চারণ করে।

কেন বাবা, জমিজমা কিছু কিছু তো সব বেটারই আছে।

তোর বাপকে শুধুস্। এ গাঁয়ের সব জমিতো তোর বাপ উবু উবু গিলেছে।

ক্ষ্যামতা থাকলে সবাই গেলে গো—সবাই গেলে।

ওরে আমার সোনা—তাইলে চেপে যাও। ঠিকই তো বুয়েচ বাবা।

হাতি দেখতে গিয়ে ছোঁড়াটা ফটাৎ ক'রে ফোত হোয়ে গালো—কি আচ্চর্য ব্যাপার!

আচ্চর্যের কিছুই নাইরে দাদা। দাঁড়াও না, বর্ষাটা ঠিকমতোন পড়ুক আকবার—বহু শালাই ফোত হবে এবার।

কি দাদা, উদিকে যাওয়া হবে? উই যে গোর দিতে নিয়ে গালো। আকবার দেখে আসতাম।

কি দরকার—শালারা সব ভাঁদুরে কুকুরের মতো হয়ে আছে—একবার যদি ক্ষ্যাপে, ছিঁড়ে ফলবে একদম।

অতএব, যুবাদল দ্রুত পা চালিয়ে ট্যাঁকসোনা অতিক্রম ক'রে গেল।

মিছিলটি তৎপর হয় গাঁ-টি ছাড়িয়ে। খুব চটপট্ পা চালিয়ে ঢালু পগাড়ে পেঁাছে গিয়েছিল তারা। এই পগাড়ের উত্তর পাশে একটি প্রাচীন আমগাছ ছিল—আশেপাশে কয়েকটি ছোটখাটো জঙ্গল ছিল—একটি বড় আকারের শিয়াল মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে দৌড় দিয়েছিল—কারণ এই পগাড়ের পিছনে সমতল প্রান্তরের বিস্তৃতি অনিঃশেষ ছিল। মৃতদেহটির খাটিয়া নামিয়ে দিয়ে বাহকগণ গামছা দিয়ে ঘাড় ও কপালের ঘাম মুছে নিয়েছিল এবং ব্যজন শুরু করেছিল। সেখানে গুমোট অত্যধিক ছিল।

অনতিবিলম্বে পূর্বোক্ত কিশোর মাটির নিচে তলিয়ে যায়। জঙ্গলে দুটি-একটি জোনাকি জ্বলেছিল বা—সন্ধ্যার বৃষ্টিটুকু শুষে নিয়ে মাটির অভ্যন্তরে জ্বলে উঠেছিল আগুন। এই তাপ বাতাসে ছিল। কোদাগুলি ঝপাঝপ্ চলছিল ন— সেগুলিতে কৃষকদের অবসাদ। এইভাবে সমস্ত কিছু বোবা। কারণ কৃষকদের প্রত্যেকেই মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে—যেভাবে জোয়াল ফেলে অসহায় মহিষ চোখ রাঙা করে বেখাপ্পা। এইসব লোক আপন আপন ভাবনায় মগ্ন—তালগাছের পাতা দাঁত দিয়ে ছেঁড়ে, মাটির চাঙড় হাতের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো করে—কেউ নরম মাটি গায়ে মাখে। এরপর একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক হুঁ হুঁ করে শুরু করে। প্রথমে খুবই ধীরে, প্রায় শোনা যায় না ; সে আশেপাশের সামান্য সামান্য শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিল তার আওয়াজ, পরে আওয়াজ ব্যক্ত হয়। সেটি হচ্ছে একটি ফাঁদে পড়া পশুর অবোধ কান্না। কাজেই কারো কিছু বলার নেই। চিৎকার বাড়িয়ে দিয়ে হাউ হাউ ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে বর্ষীয়ান্ চাষীটি শান্ত ভারি গলায় প্রশ্ন করে, কিসের কারণে কাঁদাটো হ'চে বাপ্?

এই প্রশ্নে সহানুভূতির লেশমাত্র না থাকলেও কান্নাটি ভীষণ ছড়িয়ে

যায়। আরে এই ধেড়ে হন্দু—কাঁদাটো ক্যানে—আঁ!

আমাকে কবে নিয়ে আসবে চাচা—রোদনের ভিতর থেকে অব্যক্ত প্রশ্নটি ফেটে গিয়েছিল । এবং কারও অপেক্ষা না রেখে যুবকটি কান্নার ভিতরে চুবিয়ে চুবিয়ে অশ্রুময় উত্তর টেনে আনে, আর বেশিদিন লয় গ, কবর-লাগ হলোম বলে। আর দুদিন সবুর—দুদিন সবুর—বলে যুবকটি থেমে যায়। এমন সব ব্যাপারে চাষীগুলি ভ্যাবা বনে যায়—যেনবা প্রত্যেকেই কেঁদে উঠবে। বর্ষীয়ান্ চাষীটি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে,তার হাই উঠছিল, এজন্যে নির্লিপ্ত স্থূল হয়ে যায় তার কথা, কবর-লাগ যেদি হ'তেই হয় বাপু—তাইলে তার এগু এট্টু আগুনে গা ঘষে লেগা—হাতগুনোকে এট্টু গরম করগা দিকিনি। চলো গ—আর ইখানে বসাটো কিছু লয়।

একসঙ্গেই সবাই ওঠে। শাদা রাত্রির কিঞ্চিৎ ঢালু আড়ে দীঘে বিশাল প্রান্তরে দূরে দূরে এরা ছড়ালো। যেমন হেঁটে বেড়ায় ঘুমের ভিতর।

দুটি-একটি ন্যাড়া বেল বা তালগাছ, এক-আধটি খিঁচিয়ে-ওঠা শিমুল আর পুরু ধুলো-জমা রেলপাতির জঙ্গল পার হলেই যুবাদলের গ্রামের অন্ত্যজ পাড়া। সেইখানে এসে দল থেকে ঘন্টা হারিয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে একটি চিৎকার, ঘন্টা—উক্ত উচ্চধ্বনির রেশটুকু আ আ রবে প্রলম্বিত—বাতাসে ঢেউ সৃষ্টিকারী। তৎপর হি হি শব্দে প্রচুর হাস্য এবং ভয়ানক অশ্লীল মন্তব্য সকলের জড়াজড়ি। ঘন্টা কিয়ৎকাল স্তব্ধ—তার দেহে রাত্রির নিজস্ব আঁধার। এই অন্ধকার তার দুই চোখে গভীর হয়ে জমেছিল এবং নিম্নাঙ্গে বেষ্টন ক'রে তার পা-দুটিকে এমন অদ্ভুতভাবে গলিয়ে দিয়েছিল যে সে একটি বড় আকারের বোড়া সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। এই পাড়াটি তেঁতুলে বাগদীদের—সেইহেতু সেখানে খড়ের কুঁড়েগুলি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে খাড়া থাকে—পথ কষ্টদায়ক, সংকীর্ণ উচানিচা। উঠানগুলিতে কখনো কখনো গাছ আছে। সেইসব স্থান হতে শূন্যতার শব্দ আসছিল—খুবই ব্যাপ্ত, প্রবল একটি ধূলিঝড়তুল্য যেনবা উঠানের গাছগুলি বিনাশব্দে এককালে মাটিতে সেঁদোবে, কুঁড়েগলি ভূমিস্যাৎ, লণ্ডভণ্ড, এবং এই এলাকায় প্রচণ্ড হা হা স্বর—সব শেষে স্থানে স্থানে ধস নামে, গভীর বিবরে আঁধার, চতুষ্পার্শ্বে গহ্বরে কুণ্ডলি, কাঁটাগাছের হলুদ জঙ্গল—কোনো ধারালো বাতাসেও

একটি ধূলিকণা নড়ে না। এইরূপ শূন্যতার নিদারুণ আওয়াজে যুবকটির বুকে ভয়ে খিল ধরে যায়—যেহেতু সে প্রায় জন্মাবধি এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে নি। এই হাহাকারের বদলে সে নিয়মিত ঢোলকের বাদ্যে অভ্যস্ত—দ্রিম দ্রিম আওয়াজের সঙ্গে চেরা গলার মাতাল সংগীত—উঠানে, গাছের নিচে, পথিপার্শ্বে, যতঅত্র কি জমাট আসবনিষ্ঠাই না ছিল! এসব কি জন্মাবধি দেখে আসছে না ঘন্টা নামের আধাবাবুটি? অতএব সম্পূর্ণ অপরিচয় তার মধ্যে বাসা বাঁধে—তার ভাবনায় কুলায় না যে কিভাবে ঠা ঠা মরুতে তাজা চারাটি গজিয়ে উঠতে পারে—এ পতিত ভূমিতে কেমন ক'রে দেখা দিতে পারে পিঙ্গলা—যেহেতু চতুর্দিকেই যেন উৎপাটিত মহীরুহ কেমন ছরকুটে, হস্তপদাদি বিক্ষিপ্ত, তা ছাড়া মাটির দেয়ালগুলি কোথাও ভাঙা, কোথাও হাড়ের মতো শাদা, চতুর্দিকেই ভাঙাচোরা কাষ্ঠখণ্ড, ছেঁড়া ন্যাকড়া, বৃক্ষপত্রগুলি কুটিকুটি। এ যেন শুকিয়ে ওঠা অরণ্য—এর মধ্যে পিঙ্গলার বাসের ঘরটি কোন্‌দিকে হারিয়ে যায় বা। কাজেই যুবকটি সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে আসতে চেয়েছিল—তার প্রাথমিক উদ্দামতা শুকিয়ে খট্‌খটে, হৃদয়ে আর জল নাই। বেচারির কল্পনায় তো এসব ছিল না—সে তেঁতুলে বাগদীদের হল্লা এড়িয়ে কোনোরকমে পাড়ার প্রান্তে বিধবা মেয়েটির কাছে আসতে চেয়েছিল—যেহেতু মাত্র কয়েকদিনই হয় সে তাকে বাগিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এইরকম দুঃসহ স্তব্ধতা সে জানত না—কোথায় বা হল্লা চিৎকার—আগামীকাল কি বিরাট মেলা—মায়ের পুজো; এইতো কিছুদূরে আয়োজন প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে, সেস্থলে আলো, গমগমে ভিড়, রাজহস্তী সমস্ত ওজন পিঠে নিয়েছে—তবু এখানে এমন শূন্যতার শব্দ কিভাবে বাজতে পারে তাও বাবুটির মাথায় আসে না। এখন কোনোরকমে সরে যেতে পারলেই হয়।

কিন্তু সে কোথা থেকে সামনে আসে বুঝে ওঠা দুষ্কর হয়ে ওঠে। আকাশ ছিঁড়ে বা মাটি ফুঁড়ে অথবা বাতাস থেকেই চেহারা নেয় বলা যায় না। যুবকটি সামনেই মেয়েমানুষটিকে দেখতে পায়। সে, মেয়েটি, পথিপার্শ্বের তিন্তিড়ি বৃক্ষটির ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়েছিল, তৎপর তার দৃষ্টি অনেক দূরে পথের অন্যপ্রান্তে গিয়েছিল। পতিত অঞ্চলটির সর্বত্র উক্ত দৃষ্টি শুকনা ও নিরবয়ব তামসিকতায় আচ্ছন্ন—সর্বশেষে তা ফিরে এসে নিজেরই দিকে চালিত হয়েছিল। এই খরদৃষ্টি বুভুক্ষায় আক্রান্ত ছিল—উপোসী পশুবৎ এবং পশুতুল্যই নগ্ন ছিল দেহটি—কারণ দেহাবরণটির বহুস্থানই ভিন্নভিন্ন; মেয়েটির উরুসন্ধি, কটিদেশ বক্ষাঞ্চল বিপন্ন।

তাকে বিবরসন্ধানী বলে ধারণা হয়। যেভাবে সে ঘন্টার দিকে দৃষ্টি ফেলে, তাতে ঘন্টাবাবু একটু ইতস্তত ক'রে মেয়েটির পথ সামান্য আটকে দেয়। কোথায় যেন একটি নিমন্ত্রণ ছিল!

তুই কেরে?

মেয়েটি চারপাশ দ্রুত দেখে নেয়, তারপর বাতাসের ভিতর থেকেই ফিসফিসানি উত্থিত হয়, তাতে তুমার কি গ'—এই কথা বলে সে চলে যেতে উদ্যত হয়।

যুবকটি তার বিপন্নতার পুরো সুযোগ নিতে পেরেছিল—একারণ যুবার মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে আসে—ঠোঁটদুটি পুনঃ পুনঃ চাঁটে এবং সে ঘন ঘন ঢোঁক গিলছিল। মেয়েটির আধখোলা বর্তুলাকার বুক দুটির দিকে চেয়ে একরকম মাথা কোটার ভাব এসে গিয়েছিল তার—যদিও মেয়েটি অতি শীর্ণ, তার চোয়ালের হাড় ফুটে উঠেছে, ভুরুর অস্থি যেনবা চামড়া ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসবে, তামাটে চুলগুলি বা ধাতব।

তোর নাম কিরে—কখনো দেখি নাই তো তোকে এই পাড়ায়।

আমি কালী গ'। আমাকে দ্যাখ নাই কখুনো—বুলছো কি বাবু? মোর জরমো ই গাঁয়ে—আর তুমি কখনো দ্যাখ নাই মোকে—আঁ—এই বলে সে চিকুর হানার মতো এক শানানো হাসি হাসল।

এতো রাত্তিরে যাচ্ছিস কোথায়?

এই রেতে ই পাড়ায় তুমিই বা কোতা যেচো বাবু? মজার কতা লয়কো?

মাঠ থেকে এ্যালাম—বাড়ি যাচ্ছি।

অ, তা যাও গ', যাও—কালী রাস্তার এক পাশে দাঁড়ায়।

যুবকটি তখন কি করতে পারতো—সে কোনো অজুহাত হঠাৎ বানিয়ে ফেলতে পারে না।

যাও না বাবু, দেঁড়িয়ে রইলে ক্যানে?

উক্ত যুবকটির চলে যাবার উপায় ছিল না। অনুক্ত নিমন্ত্রণটি তাকে এমন টানেই টেনেছিল। তার ভাবটি একটি হতভম্ব শুয়োরের মতো যার একটি মাত্র সিদ্ধান্ত ছিল এবং সেটি-ই যেনবা হারিয়ে গেছে একারণ সে নিজেরই অজান্তে অতি ধীরে মেয়েটিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছিল।

কালী আবার একটি সংক্ষিপ্ত চিকুর হানে, অমন করছো কেনে বাবু ক'ইলে বাছুরের মতো?

এতক্ষণে মনস্থির সম্ভব হয় ঘন্টার, আমাকে একটু জল খাওয়াবি? মাঠে মাঠে ছুটে ছুটে তেণ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে আমার। চল দেখি তোর

বাড়িতে। একটু জল দিবি।

ছোটনোকের হাতে জল খে'লে জাত যাবে যি গ' তুমার। বুলছো কি—আঁ?

ছোটজাত বুঝিন মানুষ নয়, না?

তাইলে ছোটজাত মানুষ বটে বুলছো—আরি বাবারে বাবা। ছোটজাতের জলে দোষ নাই বটে, বাহারি বাহা! ছোটজাতের আর কিসে দোষ থাকতে নাই বল দিকিনি বাবু?

তুই বল দেখি। বাবুর কিছু ভয় হয়েছিল যেহেতু মেয়েটি আদৌ হাসে না আর তার কথা পাথরে ইস্পাত ঘষার মতো, আগুন ঝিলকিয়ে ওঠে এবং কখনো বিকট হাস্য উদ্গতপ্রায়, প্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন অথচ এইসবের পিছনে একখণ্ড শ্রাবণ আকাশের বর্ষণমুখী মেঘ। সেহেতু ভিজে বাতাসও আসছিল মাঝে মাঝে।

আমি বুলবো কি ক'রে গ'? ইকি মোদের কতা বটে? উতো তুমাদের কতা। আমরা দ্যাখো শুয়োর খাই—কি বলো, শুয়োর খে'য়ে থাহি মোরা, তাবাদে ধরো গি'য়ে আমরা যোমের অরুচি লিচু জাত, লিচু কাজকর্ম্মো করি, জাত বেবসা ছেড়েছি গ', আর মোরা জেলে লই, চাষ বাস ধরেছি এ্যাকন। ই সবই তো ছোট কাজ, লয়? এ্যাকন মোদের পেটে ভাতও নাই, পরনে কাপড়ও নাই। ছোট জেতের সবেতেই দোষ। তবে একটোতে বোধায় দোষ নাই—কি বলো বাবু?

কিসে দোষ নাই?

ছোটজেতের মিয়েতে দোষ নাই। ঠিক কতা লয়, বাবু। মিয়েগুনো খায় না দায় না, তেবু তাদের গতর হয় ধাড়ী শুয়োরের মতো, লয়? ভারি মজার কতা বটে!

মেয়েমানুষটির হাসি এতক্ষণে ফাটলো। তরুণটি উন্মত্তপ্রায়, বিশেষ, তার চুল খাড়া, মাটির সমান্তরাল, বর্তুলাকার বক্ষদুটি ঘূর্ণায়মান, তার উন্মুক্ত ঊরুসন্ধিটি বিপরীত বিষম।

হাসিস্ না, অমন ক'রে হাসিস্ না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘন্টাবাবু বলল।

হারামজাদা, হাড়বজ্জাৎ বদ্‌বাবু—আমি বুলছি তুমাকে—তখন নাই বললে শুনবো না কিন্তুক, দুটো ট্যাকা দিতে হবে মোকে। তার কমে হবে না।

একটি ক্ষতির ক্ষোভ যুবকটির বুকে আঘাত করে, তার হৃৎপিণ্ড ধুকধুকায়, কারণ পিঙ্গলার বরাদ্দ আধুলিটি তার ট্যাঁকে আলাদা করাই

ছিল! সে, যুবকটি অন্যাদিকের ট্যাঁকে শুধু একবার হাত দিয়ে অনুভব করে এবং হেসে উঠে বলে, তাই নিবি যা। এখন চল, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

অন্ধকার নিচয়ের মধ্যে তাদের হাঁটতে হয়েছিল—কোথাও কোনো কলরব ছিল না—চারিদিকেই তো ধ্বংসাবশিষ্ট সকল, পতিত ইটের পাঁজার মতো। কাজেই কালী নিপুণা সাপিনীর মতোই আপন বিবর খুঁজে বের করে। সেখানে চক্রাকার নিম্নাভিমুখী সিঁড়ি বেয়ে পাতাল প্রবেশ চলে। একবার যুবকটি কবিত্ব ফলিয়েছিল, পথে কুড়িয়ে প্যালাম তোকে, কালী, ঠিক যেন আঁদার মানিকের মতোন। এই বলে সে নিজের কাঁপুনি ঠেকাবার জন্যে মেয়েটির হাত ধরতে চেয়েছিল। হাতটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এইভাবে যে বাবুর কাঁধের কাছে একটি খিঁচ-ধরা ব্যথা বিঁধেছিল। সেই সময় আরো শ্রুতি হয়, ড্যামনা মিন্‌সে—ঘরে যাবার আগে মোর গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না বলছি। সেই হেতু গর্তে ঢোকার ঠিক আগে অন্ধকারের দিকে চেয়ে যুবকটির ভীষণ ভয় হয়েছিল। কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিতে আরও ভয় শিরদাঁড়ায় হিল হিল করে। ঘরের মেঝেটি তুহিন শীতল—যুবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে, এই ঘরে তুই একা থাকিস? কি সাহস রে তোর, বাপরে বাপ!

ফস্‌ ক'রে দেশলাই কাঠিটি জ্বলে উঠল। প্রথমত অবয়বহীনতা আবছায়ায় বিধৃত, তৎপর কেরোসিনের লম্ফটি থেকে মরা আলো, মুমূর্ষু, হরিণের চক্ষুবৎ কম্পমান—এতে এই দেখা যায় যে বস্তুনিচয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, যেমন মাটির শান্‌কি—কয়েকটি অন্ন তাতে আঠার মতো সাঁটা—এছাড়া ভাঙা মাটির কলস, কয়েকখণ্ড চট, দু-চারটি ইট—আরও উক্ত বাসস্থানের দেয়ালগুলি চতুর্দিকেই ভাঙা উঁচানিচা, প্রচুর পরিমাণে ইঁদুরে তোলা মাটির স্তূপ, মাথার উপর তালপাতার ছাদ, তালপাতাগুলি পুরোপুরি ছাতার মতো স্থাপিত। এই সমস্তে ধূলিমাখানো, রুখু ও আঁশ্‌টে গন্ধ অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত। একটি রোগা ও রোগী গলার আওয়াজ এই সময় চন্‌মনিয়ে বেজে ওঠে, পচা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো, কালী, অ-কালী, ইদিকে একবার আয় হারামজাদী, বিটি নচ্ছার—

এই ব্যক্তিটির শরীর কিছুতেই দেখা যায় না—কারণ সেস্থলে আলো পৌঁছায় নি, ছায়া কালো শরীরের উপর কেঁপে যায়। রেকর্ডটি অবশ্য বেজেই যায়, কিছু খেঁতে দে গঁ—তোর পায়ে পড়ি—হারামজাদী, অতো প্যাখম মেলিস না—হেইরে গঁ—

উক্ত তরুণীটি নিরুপায়, লম্ফটি তার হাতে, সে দ্রুত ঘরের দক্ষিণ কোণটিতে গিয়ে মেঝেয় আলো রাখে, শিখাটি উথালপাথাল আন্দোলিত—সে কোনো কিছু বুক দিয়ে, মুখ দিয়ে, তার এলো চুল দিয়ে ফিসফিসিয়ে জবাব করে, তোর মুখে নুড়ো জ্বালি—শ্মশানের শ্যাল তোর হাড় চেঁটে চেঁটে শাদা কবে করবে গং, আমি হরিবোল দিয়ে বাড়ি এসবো।

এই কথায় ব্যক্তিটির সম্ভবত ক্রোধ জাগ্রত হয়—সে ঝটিতি ঘাড় তোলে কিন্তু বালিশটি তার ঘাড়ে আটকিয়ে থাকে। একটু পরেই অবশ্য আপন ভার-বশে সেটি চটাৎ শব্দে খসে পড়ে এই প্রকার চট্‌চটে ময়লা তাতে ছিল। এখন সব কিছুই ঘন্টাবাবু মোটামুটি দেখতে পাচ্ছিল—যেমন মানুষটি একটি ছেড়া-খোঁড়া চ্যাটাই-এর উপর শুয়েছিল। দুখানি ইটের উপর তার ডান পা-টি পড়ে আছে, সেই পা-টি স্ফীত। ক্ষতটি কোথাও নিশ্চয়ই দগ্‌দগ্‌ করছিল কিন্তু দৃষ্ট হচ্ছিল না, তবে ভাগাড়ে পাঁচদিনের মরাগলা কুকুর-দেহের মতো কটু গন্ধ ছাড়ছিল এই পা-খানি। আরও, মানুষটির হাড় পাঁজর সহজেই গণনযোগ্য, চক্ষুদ্বয় কপালের ভিতরে অবস্থিত। উক্ত ব্যক্তিটি মাথা তুললে লম্ফটি থেকে একটি পট্‌পট আওয়াজ ওঠে—যেন জল পুড়ছিল—এই হেতু শিখাটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। এইরূপ আলোয় হয়তো সে যুবকটিকে সামান্য প্রত্যক্ষ করে থাকবে—কারণ তার দৃষ্টি থেকে কিছু কিছু কৌতুক, বিদ্রূপমিশ্রিত বিমর্ষতা এবং কোনো নিরবলম্ব জিজ্ঞাসা ঝুলে থাকে।

মেয়েটি অবশ্য খুবই ক্ষিপ্র, সে ঘরের পশ্চিম কোণের দিকে যায়, যখন ফিরে আসে তখন তার হাতে মাটির শান্‌কিতে এক মুষ্টি অন্ন দেখা যায়, তার হাতের লোহার চুড়িটি শান্‌কিতে ঠন্‌ঠন্‌ বাজে যেহেতু ভাতের সাথে কিছু যেন সে চটকায়, ডালের মতো কিছু। কয়েকটি পিণ্ড সহজেই তৈরি হয়ে যায়—অতঃপর মণ্ডগুলি শায়িত ব্যক্তিটির মাথার কাছে নামিয়ে দিয়ে সে বেমানান মমতার সঙ্গে একটি টিনের গ্লাসে জল আনে। এইভাবে সেবাকর্ম শেষ ক'রে সে চোখের নিমেষে একটি ছেঁড়া চটের পর্দা টেনে দেয়। এই পর্দাটি টানিয়ে দিলে এতক্ষণে লোকটি অদৃশ্য হয়। একমাত্র তখনই ঘন্টাবাবু মেঝেতে পাতা চ্যাটাইটি দেখে। তার মাথার উপর কি ভয়ংকর তাত—মস্তিষ্ক গলে যায়বা এবং পায়ের নিচে এমন ক্রুদ্ধ শৈত্য যে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে যেন। চটের ওপাশেই চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ—গলনালী অতিক্রমকারী খাদ্যস্রোত ফুঁড়ে ব্যক্তিটি আঁকুপাঁকু অস্ফুট শব্দগুলি বাইরে চালান করে, লরক, লরক। লরকে যাবি তু—কুনো বাপ

আটকাইতে পারবে না তুকে—তু মাগী সোয়ামীর ছামনে লাং লিয়ে এলি গ'—ই কি সববোনাশ। ভগবান শালা, তু কি দেখিস গ'—আঁ? তু শালাও কি আমার মতুন চিৎপটাং শুয়ে মেগের ভাত গিলচিস? এইসব অভিশাপের পর আবার চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ ওঠে।

মেগের মাস খেচিস খা, কতা বলিস না খচ্চর মিন্‌সে—এই কথায় বাতাস শিউরে উঠে যেন শিৎকারধ্বনি দিয়ে উঠেছিল। অতঃপর মেয়েটির আর করণীয় কিছুই ছিল না—সে মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলেছিল, তন্মুহূর্তেই তার চোখে জল এসেছিল জোয়ারের মতো নিঃশব্দে—এতে উক্ত অন্ধকার জলে পরিপূর্ণ হয়েছিল—হয়তো হি-উ-উ শব্দে কোনো প্রখর ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল—যেহেতু এমনি মনে হয়েছিল যে মেয়েটি ক্রমান্বয়ে ডুবছে আর ভাসছে। এইক্ষণে বাতাসের কুশলতায় পুনরাপি তার চোখে আলো এসে প্রতিফলিত হয়—সেই চক্ষুদ্বয় জলমার্জিত ছিল বলেই দৃষ্টি কোষমুক্ত তলোয়ারের ন্যায় হিঁসুটে হয়ে প্রকাশ পায়, দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে তুর মা দেখচিস লিকিন্ মা মেগো বজ্জাৎ—এই বলে কালী সম্পূর্ণত নিরাবরণ হয়েছিল। যদিচ অন্ধকার অধিক ছিল না—তার কারণ, ক্ষণিকের মধ্যেই কিছু দুঃসাধ্য প্রয়াসে আলোর শিখাটি নিবাত নিষ্কম্প, তথাভূত অন্ধকার জালিকাটা নকশা ও অলংকারবহুল এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত এবং ঈদৃশ খণ্ডগুলি শিকারী বিড়ালবৎ সুযোগসন্ধানী গোঁফ-ফোলানো—যেন নিঃশব্দে কালীর বিভিন্ন অঙ্গে লম্ফ প্রদান করে। কিন্তু তাতে কিইবা যায় আসে ; অচিরেই যে ঘরের বন্ধ বায়ুতে সঘন নিঃশ্বাস বাজে, কোনো বিকট ছায়া মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়—বিপরীতে দুটি হাত এমনি মুষ্ঠিবন্ধ যে কণ্ঠের অজস্র শিরায় নির্মম টান পড়ে—দুই দন্তপঙ্‌ক্তি পরস্পরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়—একটি মাংসের শরীর শুকনা কাষ্ঠে পরিণত হয়।

এইরূপ সকঠিন সময়ে একটি প্রবল নিঃশ্বাসধ্বনি ঢাকের আওয়াজের মতো কড়কড়াৎ ডেকে ওঠে—ঘন্টাবাবু পশু সংস্কারে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে-থাকা মনুষ্যটিকে প্রত্যক্ষ করে। এই বেচারী লোকটি অনেকক্ষণের বন্ধ নিঃশ্বাস এককালে ছাড়তে গিয়েই এমন শব্দ সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে—তার ডান হাতে শাণিত টাংগিটি আক্রোশধৃত ; বাঁহাতে পাকা বাঁশের লাঠি আলগাভাবে দোলে—তার ঘাড়টি বাঁকানো—সে ব্যাদিত বদন—সেহেতু দাঁতগুলি সবই দেখা যায়—মুখের কোণ বেয়ে সর্পবিষের মতো লালা ঝরছে। আমাকে মেরো না, আমাকে মেরে ফেলো না—ঘন্টাবাবুর এই

কথা এতই অনুচ্চ ছিল যে তা বাতাসে ফিসফিসানি মাত্র, কোনো শ্রবণ না থাকায় আদৌ শ্রুত হয় না। অতঃপর তড়িৎবেগে পোশাক সামলে ঘন্টা দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে যায়। এইযে ইদিক পানে এসো গুঁ—শালা ঢ্যামনা মাগীখোর—তুর যে নিদেন কাল হেঁকেছে—ইত্যাদি বাক্যাবলিসহ ব্যক্তিটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে হাতের টাংগি তুলে ধরে। ঘন্টাবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে যায়—হয়তো বা আকাশ-পাতাল চিন্তায় সে দিশেহারা, তার চোখে কোনো পলক নেই—চোখের শাদা অংশটি ক্রমাগত বাড়তে চাইছিল—তার ডান হাতটি বুকের কাছে আধা উত্তোলিত, মাথাটি পিছনে হেলানো। পুনরপি বিড়বিড় ক'রে কিছু কথা উচ্চারণের প্রয়াসী ছিল সে। তন্মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বদলে টাংগি লাঠি বদলা-বদলি ক'রে লাঠিটি ডান হাতে নেয় লোকটি। আঘাত হয়তো ঘন্টাবাবুর মাথার উদ্দেশ্যেই এসেছিল—কিন্তু সে বড় এছোল-পেছোল ; তার বাঁদিকের পাঁজর গুঁড়ানো আঘাত এল। সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে দু-তিনটি হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি দিয়ে লাফিয়ে এইবার ঘন্টাবাবু কিছু কাজ বা খুঁজে পেয়ে ঘরের বাইরে চলে আসে। কিন্তু পথ তো তখন লুপ্ত, আকাশের নিচে বৃক্ষসকল খাবি খাচ্ছিল—তাদের উপর দিয়ে শীতের সাপের মতো বাতাস সামান্য হিলহিলে মাত্র, আঁধার ; চরাচর অসাড়—এমতাবস্থায় বহুদূরে কণ্ঠের হুন হুনানি তীক্ষ্ণ বৃংহিতে কাটাকাটা। পুনরপি ছিন্নভিন্ন। ঘন্টাবাবু সেখানে বার-দুয়েক গড়াগড়ি দেয় এবং পরক্ষণেই প্রবল তরাসে পদবিক্ষেপ বহু দ্রুত ক'রে ফেলে। কিন্তু পদধ্বনিগুলি চারিদিকেই সোচ্চার—বিশেষ, বড় রাস্তার মুখেই আবার দুটি নগ্নপ্রায় ছায়া তাকে আরো আরো মোক্ষম আঘাত দিয়ে সরে পড়ে। এখন তার বাম স্কন্ধ থেকে বাহুসন্ধিটির জোড় বিচিত্র শব্দে খুলে যায়—একারণ ঘন্টাবাবুর বাঁহাতটি ড্যাং ড্যাং ঝোলে। মেরে ফেলালে রে—এই চিৎকার আনতে গিয়ে ঘন্টাবাবু কি খেয়ালে সামান্য উক্ত করে যে, মেরো না আমাকে মেরো না গো—পায়ে পড়ি তোমাদের। কিন্তু কোনো শ্রবণ না থাকায় এসবও শ্রুত হয় না।

সেস্থলে যেনবা প্রস্তরময় ন্যাড়া পাহাড় বিদীর্ণ হয়েছিল, বনস্পতি-সমূহ উৎপাটিত উন্মূল—এইরূপ মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষ কোনো জনপদ-প্লাবী জলোচ্ছ্বাসকে ডাকে। তবু এসবই ঘন্টাবাবুর মগজের বানোয়াট বিপ্লব মাত্র। কারণ বহিঃপ্রকৃতি আশ্চর্যরকম স্থির, জলদর্পণে সমস্ত কিছুই মারাত্মক স্তব্ধ। অচিরেই প্রশস্ত পথটি প্রান্তরের দিকে মোড় নেয়, ঘন্টাবাবু কয়েকটি মুহূর্তেই শুধু আপনার মনকে আঁচড়িয়ে দেখেছিল।

যদিবা নিজেদের পাড়ায় যাবার সংক্ষিপ্ত পথটি কোনোক্রমে অতিক্রম করা যায়, একারণ সে ঘন গুল্মতায় আচ্ছন্ন জগডুমুর গাছটির পাশে গিয়ে হাজির হয়। তবে কিনা এ জায়গাটি ভারি কঠিন ছিল, মানুষ দুটি গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলে দুঃখী ঘন্টাবাবু বড়ই বেকায়দায় কোণঠাসা। মাথার উপর হাতদুটি সংস্কারবশে তুলতে গিয়ে ডান হাতটিই উঠে আসে—তার বাঁহাত যথাপূর্ব আঁকাবাঁকা দোলে। এবার তার কঠিন মাথা থেকে ধাতব শব্দ বেরোয়, ঘন্টাবাবুর রক্তটি বেশ করুণ ও নিঃশব্দ। কয়েকটি ধারা গড়িয়ে গেলে সে চোখে দেখে না যেমন, তার তেমনি কোনো ব্যথার বোধও ছিল না। তাছাড়া অপার্থিব ঔদাসীন্যও তাকে আক্রমণ ক'রে বসেছিল। সে ন্যালা নুলো মানুষের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোল খায়—হয়তো বা সেভাবেই দু-এক পা এগিয়ে থাকবে যখন সে ঢালু পাড় বেয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। তার শিরদাঁড়ায় জলস্পর্শ ঘটলে একবারই মাত্র ঘন্টাবাবু খন্ডবিখন্ড সময় বা মুহূর্তের স্বাদ পায়, তৎপরেই এইসব মানুষের কাছে সে যেনবা বেঢপ কোনো মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত হয়েছিল—মানুষরা পুনঃ পুনঃ আঘাতের শ্রমে শ্রান্ত, এলিয়ে পড়া, সমস্ত অন্ধকারের দিকে চেয়ে তখনও নিঃশব্দ কোলাহলে কেঁপে কেঁপে উঠল, কেউ কেউ পেট চেপে মূর্ছা গেল, কেউ লেজ কামড়ানো পাগলা কুকুরের মতো আপন বাহু দংশন করছিল। এসবেতেই চরম বিশৃঙ্খলা—সেজন্যে কাউকে বলতে হল, আর লয়, শ্যাষ হ'য়ে গেলছে—এই বলে প্রচন্ড লাথি কষে আবার বলে, সবই আক্রা গ'—শুধু মেয়ে মানুষ শস্তা, লয়? শালো কুকুরের জম্মিত শুয়োর, মজাটো বোঝ কেনে এখুন। শালোকে ভদ্দর নোক পাড়ার পাঁচ-গড়েতে দিয়ে আসি—নাকি গ'—আঁ?

•

কতক সময় আগে থেকে ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। যে সমস্ত সংকীর্ণ খাঁড়ির শীর্ণ জলধারা এই অঞ্চলের শুকনা খট্‌খটে হিঙগুল মাটির উপর হিংস্র পশুর শক্তিমান নখরের আঁচড়বৎ—তারা নিজেদের অজ্ঞাতে শনৈ শনৈ পাথুরে মাটি কাটে। তীরের বলিষ্ঠ বৃক্ষসমূহের শিকড় জালের মতো ছড়ানো। এইরূপ শিকড় ধপধপে শুভ্র—খাঁড়িসমূহ ধীরস্থির পাকে পাকে অতি কষ্টে এগিয়ে চলে, হয়তো শেষে তাদের শুরুতেই ফিরে আসে ; তাদের কিছু কিছু জল চাই, তারা সামনে যেতে যেতে আকাশ থেকে জলপানে নিরত হয়েছিল। এদেরই কেউ মাটি গুঁড়িয়ে ফেলেছিল, গভীর খাদ

প্রান্তরের দেখা পেয়ে তার সমতল হয়েছিল অতএব সেই সংগমস্থলে জটিল গুল্মজাল ও কিয়ৎসংখ্যক বৃহৎ তরুর জঙ্গল আছে। এই বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে কাজেই কোনো কুটিরই চোখে পড়তে চায় না। কিন্তু ঐস্থলে একটি কুটির ছিল। কুটিরটি দারুণ গ্রীষ্মকালে গভীর ছায়ার থাবায় মাথারাখা কুকুরের ন্যায় বিশ্রামরত। ঐ কুটিরে কোনো কাষ্ঠনির্মিত দরজা ছিল না, সেই হেতু দরজায় ধাক্কা দেবার কোনোই প্রশ্ন নেই, শুধু অর্গলটির রজ্জুবন্ধন একটি মাত্র প্রবল লাথিতে ছিঁড়ে যায় এবং অভিরামের ভ্রাতুষ্পুত্র গায়ক মনোহর সেখানে প্রবেশ করে। এই ব্যক্তির শরীরে প্রচুর কর্দম ছিল, কিছু কিছু রক্তের ছিটা, একটি গভীর ক্ষত উরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বমান, আরও, তার চোখে ভয়ানক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, তার আপাদমস্তক ভিজে জবজবে—একারণ বদ গন্ধে টেকা দায় গৃহবাসিনী কৃষ্ণভামিনী মৃদু আর্তনাদে আপনার মলিন শয্যা ছেড়ে এসেছিল, তবে পরিচিত মানুষ দেখে সে সামান্য পরিমাণে আশ্বস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে শংকা ও ভীতির বদলে প্রবল উৎকণ্ঠা মেয়েটিকে মুহ্যমান ক'রে দেয়। সে তার দুই চক্ষের দৃষ্টি একত্র ক'রে মনোহরের মুখের উপর আটকে ফেলে—যে মুখের উপর কেরোসিনের লম্ফের আলো পুনঃ পুনঃ লক্‌লকে জিব বুলিয়ে যায় এবং উপরিস্থিত প্রশাখার আঁধার ছায়াও বারবার যাতায়াত করে কারণ তখন জোরালো বাতাস ছিল। এইভাবে মেয়েটি বারকয়েক তার দৃষ্টিবিন্দুকে স্থানান্তরিত করে মনোহরের নাকের ডগায় একটি বৃষ্টির ফোঁটা ঝক্‌ঝক করছিল, যে কোনো মুহূর্তে ঝরে পড়বে এইরূপ ; সে হতাশ মৌন আশ্রয় ক'রে ভাঙা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসেছিল, তার পায়ের উপর মৃদুশব্দে জল বয়ে যাচ্ছিল, একটি বৃহৎ কেঁচো তার গোড়ালির ক্ষতে লটরপটর। তখনো কিছু কিছু বৃষ্টি হচ্ছিল।

তুর বাবা কুথা ভামিনী? মনোহর এইরূপ প্রশ্ন করে।

বাবাতো বেইরে গে'ইছে—আসে নাই আখুনো।

বটে?

হেঁ, সাঁঝের বেলা বাবা বেইরে গ্যালো। কিন্তুক তুমার কি হইচেঁ?

একটো মানুষ খুন ক'রে ফেল্‌লম এই কতেক সোমায় এগু জান্‌লি?

বলছ কি গঁ?

হেঁ র‍্যা, বড্ডা ডর লাগছে—তাই তুর কাছে এলম। যদি—এইস্থলে মনোহরের কথায় অস্বাভাবিক কোনো প্রত্যাশা থেকে থাকতে পারে, সে কারণ তার কণ্ঠে দ্বিধার কোনো অন্ত ছিল না।

কে খুন হোঁলো বটে? কারা খুন করলে গ'?

সি এ্যানেক নোক মিলে খুনটো করলে, বুইলি!

আরি, আরি, সববোনাশ, কেনে মানুষ মারলে নোকে,—আঁ?

বেপারটি মজার বটে র‍্যা। মানুষ খুন? আরি বাপরে ইকি সোজা কতা! তেবু নোকটো খুন হোল বটে। খুন শালো আমিও করলম। কথাটো বোঝ ক্যানে ভামিনী।

আমি যি বুঁইতে পারচি না গ'—মুটেই বুঁইতে পারচি না—কৃষ্ণভামিনীর মুখের চেহারা এঁকাবেঁকা হয়েছিল—চোয়ালের হাড় নড়বড়ে হল।

হঠাৎ বৃষ্টি থেমে বায়ু-শব্দে কানে তালা লাগে—কুটিরটির চতুষ্পার্শ্বস্থ ঝোপে বাতাস আটকে হাঁজর পাঁজর, ঊর্ধ্বে শাখা-প্রশাখা পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ে এবং মটমট শব্দে কিছু কিছু ডালপালা ভেঙে নিচে পড়ে, দূরে খাঁড়ি সমূহের অতি উচ্চ পাড় অস্পষ্ট দেখা যায়—এই কালে ক্লান্ত হস্তী মর্মভেদী চিৎকারে সংগী ডাকে: উক্ত বিব্রত অসহিষ্ণু আহ্বান তীরের বেগে প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে কোনো নিরেট অন্ধকারে আমূল গেড়ে গিয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে।

তু ঘুমিয়ে আচিস ভামিনী, আঁ, ধর তু ঘুমিয়ে আচিস, এই সোমায় কুনো শালা তুকে এঁকড়ে ধরলে—সি যি শালাই হোক—ধর আমিই হলাম, কি করবি তু আঁ? বল কি করবি? একথায় ভামিনীর নড়বড়ে মুখাবয়ব এবার যথাযথ—তাই নয় শুধু, মাংসপেশি গুলি কোনোকুনি সোজা বাঁধন চালিয়ে সেই তরুণ মুখমণ্ডলকে মজবুত ক'রে মেরামত ক'রে দিয়েছিল। চোখের দৃষ্টি ঝকঝকে নীল হিংস্র হয়েছিল।

সি যি ঢ্যামনার কাজ, এমুন কে করলে বটে?

এমুন কেউ করে না। ধর কেনে, তুর প্যাটে ভাত নাই, পরনে তেনা নাই—কি ক্ষিদের জ্বালায় তু জ্বল্‌চিস গ—আঁ, মাথায় বুদ্ধি নাই, হেদয়ে বিবেক নাই, বুকে দয়া নাই, শুদু প্যাটে আগুন জ্বলচে, প্যাটের ওপরে কিচু নাই—প্যাটের নামোয় সব শুকিয়ে গেলচে—হায় গ—তুর মাথা যি খারাপ গ আঁ—এমুন কালে পাড়ার বাবু টাকার তাড়া দেখিয়ে তুকে তার সাতে শুতে বললে—

এসব কথা-জাত উত্তেজনাহেতু ক্ষণিক বিরাম শেষে গায়ক মনোহর আবার বলে, ইতিমধ্যে বৃষ্টিতে বিরাম, ঝড়ো বাতাসে ক্ষান্তি; বৃষ্টিতে দগ্ধ দ্রব্যসমূহ হতে বড় কটু ভেজা ছাই-ছাই গন্ধ এবং এই যে ভয়াকুল

বিপুল দেশে অস্থিসমূহ ছিটিয়ে আছে, কোথাও বা স্তূপীকৃত, হা-হা, দুর্ভিক্ষের উদরে ক্ষুধার সম্ভার থরে থরে সাজানো ছিল—সে সমস্ত আকাশচুম্বী ও পাতালমুখী, সমুদ্রতরঙ্গবৎ, আসে ও চলে যায়, গভীর নিশীথে বা হায়েনার মতো ডাকে,—তাই মনোহর চমৎকার সামঞ্জস্য ক'রে বলে, আই গ' ভামিনী, ই দ্যাশ শুকাল্ গেল্ছে ইখানে তুর গোরুটো রোদে পুড়ে ধরফরিয়ে মরে গ'—পাঁচ কোশের মাথায় যমদূত শালা খাড়া'আর এই পাঁচ কোশের ভিতরি একটো ঘাসও নাই -উঁরি বাবারি বাবা, কিঁ ভংকর বেপার বটে। মাঘের ধানে খরা পেরোয় না, মাঠের ধান আসে নাই, ই বাদে আবার বাবু মশাইদের মিয়ে মানুষ চাই—

মনোহরের এই বিবরণ আপন তীব্রতায় আপনিই ছিঁড়ে গেলে বেচারার হঠাৎ বাক্‌রোধ হয়, কিন্তু তাতে নিবৃত্ত হবে এমন লোক সে নয়, একারণ দু-চারটে ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে সে আবার বলে, সি আবার কেমুন? সোয়ামী শালা গলে পচে হেজে গেঁইচে, আজ বাদ কাল মরবে, তা সি শালো দেখতে পেচে গ, প্যাটের আগুন লিয়ে, আঃ গ, চোখে জল লিয়ে বৌ এঁসে পরপুরুষের সাথে—

শব্দহীনতা এইরূপ চরম ছিল যে, যে সময় কৃষ্ণভামিনী আপন কণ্ঠনালী বহুভাবে ছিঁড়ে ফেলে ক্রন্দনের চেষ্টা করছিল—সে শব্দ ন্যায়ত ধর্মত অবশ্যই অসহ্য ছিল। এতে মনোহর ভীত হয়ে শুধু এই বলে তার বিবরণ সমাপ্ত ক'রে দিয়েছিল যে, পাড়ার সবাই মিলে উক্ত শূকরজাত বাবুটিকে নিকেশ ক'রে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এরূপ আরও আরও ভদ্দর নোক নিশ্চিতই নিধন হবে।

কিন্তু ক্রন্দনটি ক্রমাগতই অধিকতর অশান্ত হতে থাকে, আই গ', আমাদের কি উপায়—আহা রি, ই পোড়া দ্যাশে কাজ নাই, ইখানে অন্ন নাই, ভদ্দরনোকে ভাত ছিটিয়ে মেয়েমানুষ ন্যাংটো করবে গ'—আঃ হায় হায় রি —ইত্যবসরে মনোহর আপন অবিন্যস্ত কটা চুলগুলিতে হাত চালায় এবং ভীষণ ভাষায় থেমে থেমে বলে, মেয়েমানুষের ইত্যাকার নখড়া সে কোনো-ক্রমেই সহ্য করতে পারেনা—আরও বলে যে সে ভীত কারণ হত্যাকাণ্ডটি আগামীকাল কিছুতেই চাপা থাকবে না এবং পল্টন পল্টন পুলিশ লাঠি হাতে এই অচ্ছ্যুৎ পাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়বে—তবু মৃত্যু কি জীবনে একবারই আসে না? এবং সেইসব চিম্‌সে দুর্গন্ধ বদ মরণ মরতে যে দুঃসহ ক্লান্তিতে ভুগতে হয়—তার চেয়ে একটি উজ্জ্বল হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধ কি প্রচণ্ডভাবেই না কাম্য! এই কথা মনোহর খুবই ভালবাসা এবং মায়ার

সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল এবং কথা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটিতে সামান্য কিছু নরম আলো পড়েছিল—এজন্যে বাক্যের তীব্রতা চলে যায় ; উপরন্তু ভামিনীর আফসোস সহ অবিরত ক্রন্দন যথেষ্ট কোমলতা আনে, তার চক্ষুজাত অশ্রুবিন্দুগুলি সামান্য রঙিন, নিঃশ্বাসেও যেন সুরভি আছে—তাই ধীরে ধীরে মনোহরের উত্তেজনা শান্ত হয়, সে মেয়েটির পুরো নাম উচ্চারণ করে, কৃষ্ণভামিনী!

বল গঁ।

কাঁদচিস্ ক্যানে বল দিকি? আঁ!

এ্যামুন বেপদ ক্যানে? আমাদের এ্যামুন বেপদ ক্যানে—মেয়েটি পুনরায় ফোঁপাবার উদ্যোগ নেয়, ই কি অত্যাচার গঁ?

সেই লেগেই খুন হলো।

একন কি হবে?

কি আবার হবে—বদ্‌মাইসরা লিকেশ হবে। ইবার আমি মরব, তা বাদ তু মরবি। তা বাদ? ই হি রে—আমরা যি রক্তবীজের ঝাড়—লয়কো?

এসব কথা বলে মনোহর কৃষ্ণভামিনীর হাতে হাত দিয়েছিল—অতঃপর লম্ফটি নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং মেঘদল দূরে ভেগেছিল, বায়ু শুষ্ক হয়েছিল—খাঁড়িসমূহের জলপ্রবাহ ঘষ্টাতে থাকে—এসবের মধ্যস্থিত বাক্যসমূহ দুর্মর প্রাচীন পাথরের গায়ে খোদাই-লিপির মতো—যেমন তাতে এমন অতি সাধারণ স্বীকারোক্তিগুলি ছিল, তুকে ছাড়া আমি মরব ভামিনী—কিছুতেই বাঁচব না গ—এমনি আমার অবস্থা, আমি বুঝিনা কিচু—আঁ। এমুন করিস না—এমুন করিস না।

ক্যানে, তুর ভয় লাগে ভামিনী?

হিঁ—তরাসে পেরান যায় আমার।

খালি এই রাতটো তা বাদ কি হবে ভামিনী? পুলিশ আসবে গঁ। পাড়াটো বরবাদ হবে। অতঃপর নিজেই আবার গর্জন ক'রে ওঠে, দেখি শালা কি করে। খুন একন হবে ভামিনী। একটো লয়, দুটো লয়—বহুৎ বদরক্ত বার করবো বুঁইচিস্।

আজ রেতে মায়ের পুজো লয়?

উ কতা আর বুলিস না ভামিনী। পুজো লাফ মারচে।

ক্যানে গঁ—রেতে পুজো হবে না? ডাকবে না তুকে?

উ কতা আর বলিস না বাপু। যি বেপারটো হলো, আমি আজ ঘর যাব না।

খুঁজবে যি তুকে। তু ছাড়া বাবুদের পুজো যি হবে না।

ভামিনী, আই ভামিনী—খুনটোর কতা এই রেতে জানাজানি হলে আমারও হ'য়ে যাবে। বলিদান হ'য়ে যাবো। ঠাউর মশায়ের হাতে খাঁড়াটো আমি দেখতে পেচি পষ্ট। ঐ খাঁড়া লিজের হাতে লিয়ে ঘন্টাবাবুর বাপ কোপ বসাবে আমার ঘাড়ে। লয়কো?

এই রেতে জানাজানি হবে ক্যানে? বাবুর বাড়ির লোক ভাবচে পুজোর ফুর্তিতে মজা মারচে বাবু। মদ টদ খে'য়ে কোতা হয়তো গড়াগড়ি খে'চে। নাইলে মোদের পাড়ায় এসে পড়ে আচে।

এরপর উক্ত খাঁড়াটি ঝুলতেই থাকে। এসব আলাপের পর, বৃষ্টি থেমে গেলে এবং হাওয়া পড়ে গেলেও। একারণ রাত্রিটি ভয় মাখানো—অর্থাৎ পিছল—যথা মনোহর পুনঃ পুনঃ পা রাখতে গিয়ে পড়ে পড়ে যায়, তদুপরি ঘন্টাবাবু পটল তোলার পরেও চোখ খুলে আছে—এই দয়া কারও হল না যে তার চোখদুটি বন্ধ ক'রে দেয়, মৃতের জগতের অন্ধকার তার দুচোখে লেপে দেয়। অতএব সে চূর্ণ মস্তক, জোড়খোলা অংগাদিসহ দুইটি চক্ষু মেলে রইল। এই দৃশ্য প্রকৃতই ভয়ংকর। মনোহর ভামিনীকে নিকটে আকর্ষণ করেছিল, কোতা কোতা সব চলে গে'ইচে, লয়কো ভামিনী?

কার কতা বুলচো?

পাড়ার নোকের কতা বুলচি।

কোতা গেইচে'?

তা আমি জানি না। এখন কেউ আর বাইরে নাই। তুর বাবা কখুন আসবে?

কি জানি।

সি আর এই রেতে আসবে না।

সম্ভবত সময়টি এখন দ্রুত সরে সরে যাচ্ছিল—কেমন যেন পলায়নপর মনে হয়েছিল—যে কারণ মানোহর আপন আবেগ সামলাতে অক্ষম হয়, ভামিনী, তুকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছেলম গ'—তা দ্যাশটোর দিকে তাকা দিকিনি—উরে বাবারি, রোদে যেন চোখ ধে'দে যেচে—পুড়ে যেচে সব—তুর ঘর নাই, বাড়ি নাই, জমি জেরাত নাই, কলুর বলদের মতুন খেটে যাবি গ' শুদু—তা বাদ এই আকাল। হাড় চরচরানো আকাল—

মনোহরের নিঃশ্বাস বইছিল ঘন ঘন—মুখে ফেনা ভেঙে গাঁজলা ওঠার মতো—যখন ভামিনীর সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠতর হয় এইসব শ্বাস দীর্ঘায়িত, প্রান্তর ইতিমধ্যেই শুষ্ক, একারণ হাওয়া বিব্রত, শুকনোও বটে—মনোহর

বাইরে মাঠের দিকে চেয়ে, তথায় কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না, তবু যেন যবনিকা উঠছে।

তাদের কথা অমৃতের মতো—যদিও তাতে ক্রমাগত বিষ্ঠাপাত হয়।

মনোহরের পা টলছিল। তার এইরূপ মনে হয়েছিল যেন মগজ চলকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়বে—বিশেষ, সর্বত্রই অদ্ভুত রকম নেতি, লুপ্ততা, ভয়াবহ আঁধার, পুনরপি মেঘদল আকাশে সাজছিল.; যখন খুশি আকাশ বর্ষণমুখী হয়ে যাবে। তেঁতুলে বাগদীদের পাড়া থেকে ভদ্রপল্লীর দূরত্ব কি অতি সামান্যই নয়? এদিকে পথ পোড়ো ভিটের উপর দিয়ে—অর্থাৎ কোনো পথই নেই, শুধু ভাঁট, আসশ্যাওড়া, জগডুমুর ইত্যাদি—কিছু বিশীর্ণ শিমুল ও বুনো আতা বা আমড়ার সমাবেশ—কিছু লোমওঠা শিয়াল এবং বন বেড়ালের নিঃশব্দ অস্তি। এ সবের মধ্যে মনোহরের পা টলে—সংক্ষিপ্ত ক্ষেতটুকু পার হয়ে সে বালুময় প্রশস্ত গ্রামপথে পা বাড়ায়। তার কাছে ডাক এসে গেছে। এই স্থলে, এই ফাঁকায়, দুর্দান্ত তেজে কাড়া নাকাড়ার শব্দ চলে আসে। এতক্ষণ এই শব্দ দূর আকাশে মেঘের গর্জনবৎ ছিল—গুরু গুরু, ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্—বর্তমানে নরক গুলজার—কাঁসিটি মাথার ভিতরে ঝাঁই ঝাঁই শব্দে বাজে—যেনবা পৃথিবীর ভিতর থেকে উত্তপ্ত জল, বাষ্প ইত্যাদি ছিটকে বেরিয়ে আসবে। মনোহর আপন গোড়ালির ক্ষতটি ভিজে ন্যাকড়ার পটি দিয়ে কিঞ্চিৎ আড়ালে ঢাকতে চেয়েছিল—ন্যাকড়াটি খসে গেছে।

সমস্ত কিছুই সুষুপ্ত এমন প্রতীয়মান হতে পারে—ওপাশে মেলার উপর আকাশ আবছা আলোকিত, তবে সম্পূর্ণতই ঘুমন্ত—আমার কি হবে গঁ—একথা ভেবে মনোহরের খুবই ভয়, অধিকতর আক্রোশ ও ক্রোধ দেখা দেয়। সেই শিরখ্যাঁচা গানের মতো—ও তুই চোখে দেখবি অন্ধকার—অন্ধকার শব্দটিকে বিশ্রীভাবে এলিয়ে দিয়ে অন্ধকার উচ্চারণের মতো। মনোহর গামছাটিকে কষে কোমরে বেঁধে নাভিমূলে গিঁট বাঁধে। অতঃপর গুটি গুটি এগিয়ে পাষাণপুরীটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। স্থানটি পূজাস্থল বটে—মন্দিরও এখানে স্থাপিত; কয়েক একর পরিমাণ জমি প্রাচীরবেষ্টিত, যেমন কারাগার; প্রাচীর সুউচ্চ, বড়ই মসৃণ ও সিধা, পবিত্র ধপধপে। এই বিশাল চতুষ্কোণ দেবস্থলে প্রবেশ ও নির্গমনের দুটি মাত্র ফটক—ক্ষতবিক্ষত কঠিন শালের দরজা, ভিতরে প্রবেশ মাত্রই বিচ্ছিন্ন, সহায়হীন,

যদিও প্রায়শই খেঁকি কুকুর অনন্যপূর্ব পন্থায় অন্দরে প্রবেশপূর্বক দেউলের গায়ে মূত্রত্যাগ ক'রে থাকে। মনোহর ফটক পেরিয়ে, ধূপধুনার ভারি বাতাস ঠেলে সরিয়ে রঙ্গস্থলে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মানুষজনের চক্ষুসকল আনন্দে জ্বলে ওঠে—বাজনদারদের হাতে নাকড়াগুলি চড়্বড়্ শব্দে কানে তালা ধরিয়ে দেয়, ঢাকগুলি নদীতে ভূমিধ্বসের বিকট আওয়াজ করে। আলো অতি সামান্য—মাত্র দুটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল, কিন্তু ঘরভর্তি লোক—তাদের পরনে রক্তবর্ণের বসন, ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, কপালে রক্তচন্দন, যেনবা কাপালিকসমূহ; তাদের তাগা-বাঁধা বাহু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—এ সময় কোনো বাজনদারের বাবরি ছড়িয়ে যায়—সে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে দুই পা দিয়ে বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটে। এইসবের মধ্যে পুরোহিতটি অতিমাত্রায় গম্ভীর, আপন মহিমায় সে এখন হাস্যকর, কারণ তার দন্তহীন মুখগহ্বরের মধ্যে ঠোঁট দুটি ঢুকে গিয়েছিল—তার চোয়াল ভেঙে চুরমার, তার মস্ত টিকি সম্বলিত ন্যাড়া মাথাটি খ্যাঁঙরা কাঠির মাথায় বসানো নারকেলসদৃশ ছিল এবং তার মদ্যপ চরিত্রহীন চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি একরূপ কাতর, নিস্পৃহ অথচ নিষ্করুণ। এই ব্যক্তির শীর্ণ ঠ্যাং—কিন্তু উদর জ্বালার মতো, সে হাত তুলে ইঙ্গিতে বাজনা থামাতে বলে।

মুহূর্তেই স্তব্ধতা আসে। মধ্য রজনীর ভার আসে। এইসব স্থলে ঢলঢলে পাঁকের মতো অন্ধকার সেঁদিয়ে যায়, হু হু ক'রে ধুনা পোড়ে। যেভাবে গলগলে ধোঁয়া বেরোয় তাতে সকলেই একটি শাদা পর্দার আড়ালে চলে যায়। পর্দার অন্তরাল থেকে পুরুত বলে, মা, মাগো।

মনোহরের গায়ে কাঁটা দেয়, সমবেত চিৎকার ওঠে, মা, মাগো।

পুরুত বলে, এইবার মায়ের বলি হবে—

পুনরায় মনোহরের গায়ে কাঁটা দেখা দেয়।

এইবার বলি—মায়ের বলি—সমস্বরে প্রেতকণ্ঠ যেনবা প্রতিধ্বনি তোলে।

মায়ের মহিমা কে জানে—কে বলতে পারবে মায়ের পুণ্যকথা—

ঐ পাশে মূর্তির সামনে, পর্দার আড়ালে অসংখ্য শব্দ—ভারি, বুড়োটে, বদ্খত শব্দের স্রোত—মনোহর চোখ মট্কে দেখে একটি পাশে, বাইরে অভিরাম ঘাড় গুঁজে বসে আছে—বাক্যস্রোত এবম্প্রকার, মা হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী সর্বাঙ্গসুন্দরী কল্যাণময়ী মূর্তি, কখনো ক্ষুদ্র ফুটফুটে একটি বালিকা কখনো যৌবনবতী কুমারী কন্যা, কখনো বিবাহিতা তরুণী, ভরপুর তৃপ্তহাসিনী, কোলে নানা বয়সের অপোগণ্ড ছেলেপিলে—মা তখন পরমা সাধ্বী—মা, এই আমাদের মা। বৃদ্ধপুরোহিতের অতিলৌকিক কণ্ঠ এক

নাগাড়ে বর্ণনা করে, এই কাহিনী এতদ্দেশে প্রচলিত আছে—মায়ের কি অপার মহিমা—কি অপার করুণা সন্তানের প্রতি দেখ—এই কাহিনী প্রচলিত আছে যে মা কখনো কোনো একদিন কোনো নির্জন খররৌদ্রের দ্বিপ্রহরে যখন কোনো শাঁখারী এই গ্রামের পথে পথে ডেকে ফিরছিল—ঐ ব্যক্তি ঘর্মাক্ত, অবসন্ন, খদ্দের পায় নি, বেটা নেহাৎ হতদরিদ্র হতভাগা অন্নহীন সে আমাদের বিশাল দিঘির বাঁধা ঘাটে গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছিল, দিঘির উচ্চ পাড়ির উপর চতুষ্পার্শ্বে বট এবং অন্যান্য বিটপীসমূহের ঘন নিবদ্ধ ছায়া এবং স্থানটি ঠাণ্ডা ও জনবিরল—এই অবস্থায় একটি ষোড়শী বালিকা—আহা কি তার রূপ, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, গুরুনিতম্বিনী, আহা কি অপরূপ ঐ বালিকা, সে এসে আপনার সুডৌল সুগৌর হাতদুটি নিঃসঙ্কোচে শাঁখারীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বসে। শাঁখারী বেচারী বড়ই উল্লসিত হরষিত মনে আপনার মনোমতো শ্বেতশুভ্র শাঁখা ঐ দুটি হাতে পরিয়ে দেয়। এইস্থলে পুরুতটি আবেগে কেঁদে ফেলে এবং সে ক্রন্দনপরায়ণই থেকে যায়—অতএব সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে, নাক মুছতে মুছতে বলে, শাঁখারী কি ভাগ্যবান সে মেয়েটির হাত পর্যন্ত ধরতে পেরেছিল—অহো, সে কি পরম সৌভাগ্য নিয়ে এই পৃথিবীতে শাঁখা বেচতে এসেছেল—কিন্তু গরীব বেচারার নগদ পয়সা জুটলো না—কারণ শাঁখা পরা শেষ হলে সেই মেয়ে বলে, মন্দিরের পুরুতের কন্যা সে, তাকে গিয়ে মেয়ের শাঁখা পরার কথা বললেই শাঁখারী আপন পাওনা বুঝে পাবে। এখন এই পুরোহিত কি মহাপুণ্যবান অনুধাবন করো—আমারই পূর্বপুরুষ, হায়রে মানবজন্ম, কেউ শূকরবৎ অস্পৃশ্য কেউবা দেবতা—এ মহিমা কে বোঝে—যাই হোক, পুরুত ঠাকুরের কোনো কন্যা ছিল না, তিনি শাঁখারীর দাবি অগ্রাহ্য করেন। শাঁখারী বলে, মশয় আমি আপনার কন্যাকে শাঁখা পরিয়েছি—বেটিকে খুব মানিয়েছে। পুরুত ঠাকুর বলে, কি আপদ, আমি বর্তমানে বিপত্নীক, জীবৎকালে আমার স্ত্রী কখনো সন্তানবতী হয় নি। শাঁখারী বলে, মশয়, কেন মহাপাপের ভাগী হচ্ছেন আজ্ঞা? আপনার কন্যা দিঘির বাঁধা ঘাটে স্নানরতা, স্নানপূর্বে আমার কাছে শাঁখা পরেছে। অতএব দুজনে বাঁধাঘাটে উপস্থিত হয়ে দেখেন ঘাট শূন্য, পাকা শানের উপর গুটিকয়েক পায়রা শস্যকণা খুঁটে খুঁটে খায়। দিঘির অতল কালো জল নিস্তরঙ্গ। কন্যা কোথায়? পুরুত দাবি করে। কিন্তু তাতে এই ফলমাত্র হয়েছিল—যেহেতু মা পরম করুণাময়ী এবং শাঁখারী মাকে কোনো প্রকার হতচ্ছেদা করেনি বরং ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, এইতো ছিল—কোথা গেল গ—অতএব এই

ফল হয়েছিল যে দিঘির স্তব্ধ জলতল ভেদ ক'রে দুটি শাঁখাপরা হাত নিঃশব্দে উঠে এসেছিল এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জলে রূপের ঝিলিক তুলে পুরুত ঠাকুরকে বেকায়দা হতভম্ব ক'রে, বুকে তীব্র আকুলতা জাগিয়ে উক্ত মণিবন্ধ দুটি পুনরায় জলনিম্নে অন্তর্হিত হয়েছিল।

এইভাবে গল্প শেষ ক'রে পুরোহিত ঠাকুর চোখ উল্টে দেয়, মুখভাব প্যাঁচার মতো, অল্পে অল্পে দুলে দুলে মায়ের মহিমা উপলব্ধি করে ; উপস্থিত কেউ কেউ অবশ্য উশখুশ, বৎসরে বৎসরে এই গল্প চলে আসছে, তবু বুড়ো গল্পটিকে কিভাবেই না রসায়—আঁ, বাপু রসায় মন্দ না—তবু কাহিনীটা এট্টু রসেছে, নয়? বাসি মাছের মতোন। বাজনদারের দল ফসফস শব্দে বিড়ি টানে—ঢাকের কাঠি দিয়ে কানের পাশ চুলকোয়—এসব এজন্যে যে তারা কস্মিনকালেও কোনো কথা শোনে না—তারা ঢাকের ওজনই সইতে পারে না, মাথা ঘাড়ের উপর ঢুলে ঢুলে পড়ে যায়, চোখেও যেন ভাল ঠাহর হয় না—অবশ্য কিছু কিছু ভক্তিমান ভদ্রব্যক্তি অকস্মাৎ খিঁচিয়ে ওঠে, কি দাঁত বের ক'রে হাসিস ফ্যাক্‌ফ্যাক্‌ ক'রে? কি সব হয়েছে আজকাল! দেবদ্বিজে ভক্তি—আ-ছি, ছি—

পুরুত ঠাকুর গ্যাঁজা খেয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি পুরুত ঠাকুর গ্যাঁজা খায় ব্যোম ভোলানাথ বলে গ্যাঁজার কলকেয় দম দেয় ঠাউর মশাই।

এই কণ্ঠটি কোনো ফাজিল কিশোরের—অতএব নিস্তব্ধ দেবস্থলে রিন্‌ রিন্‌ শব্দে বেজে ওঠে। কিশোরকে দেখা যায় না, কিন্তু তার ছিবলেমি হাসি প্রমাণ দেয় যে কথাটি মিথ্যা। তৎক্ষণাৎ এইরূপ বেয়াদবিতে পুরুত ঠাকুর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রক্তবর্ণ করে—কারণ সে জীবনে গঞ্জিকা সেবন করে নি এবং অদ্য রজনীতে কারণবারি ছাড়া অন্য কিছুই স্পর্শ পর্যন্ত করে নি।

কে বললে এই কথা? কে? প্রবীণ ব্যক্তিরা বলে, হায়—এই দেবস্থলে—কি সর্বনাশ!

সব গ্যাঁজা—গুলি মারো, গুলি মারো—অন্ধকারে কণ্ঠস্বর হারায়।

পুরোহিত স্রেফ বলে দেয়, নিব্বংশ হবে, নিব্বংশ হবে।

এতে আর কি সুরাহা হবে, বহুক্ষণ সময় না কেটে যাওয়া পর্যন্ত পরিবেশ আর উপযুক্ত গম্ভীর হয় না। ভারি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শ্রুত হয়, আলো কমে, ধোঁয়া স্থির হয়ে জমাট বাঁধে—অতএব ভাবগম্ভীরতা ফিরে আসায় ঐ স্থান আবার ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—ভীমকণ্ঠে পুরুত বর্ণনা করে, তার শিখাপুঞ্জ খাড়া, ব্যক্তিটি খুবই উদ্দীপ্ত প্রৌঢ় মেড়ার মতো নিষ্ফল ঢুঁ মারে—তার কপাল-জোড়া সিন্দুর—সে পুনরায় মহি-

মান্বিত বোধ ক'রে বর্ণনা করে, এই স্থান অর্থাৎ এই চাকলা মহাপুণ্যভূমি, একটি পীঠস্থান, দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড ক'রে, সমস্ত কিছুর বিনাশ সাধন ক'রে আপনকার গভীর শোক প্রশমনের জন্যে সতীর দেহ চক্রে স্থাপন পূর্বক বহুধা বিভক্ত করেছিলেন। সেই সতীর দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি এই স্থানে ছিটকে এসে—হ্যাঁ, এই স্থানেই ছিটকে এসে পড়েছিল। আঃ, এখন আর সেদিন নেই, একদিন এখানে লক্ষ বলি হতো, মনুষ্য বলি হতো, মহিষ বলি হতো—অসংখ্য ছাগ বলি হতো। এখন ভক্তি নেই। এখন আর কিছুই নেই। এখন সবই কঙ্কাল। তোমরা সবাই দেখ, আজ এই মহাপুণ্যের দিনে, বৎসরের এই একটি দিনে, বৈশাখী সংক্রান্তির রাত্রি মায়ের পুজোর রাত্রি, এই দিনে জননী কতোই না ক্ষুধাতুরা, তৃষ্ণাতুরা ; আহা, বেটির জিব শুকিয়ে গেছে। একদিন জননীর ভোগ্য ছিল চমৎকার নরমাংস—এখন সেসব দিন গেছে—এই তেঁতুলে বাগদী অভিরামের বংশের জোয়ান সন্তানরা যুগ যুগ ধরে মা-কে রক্ত দিয়ে আসছে—অচ্ছ্যুৎ বাগদী হোল মায়ের খাদ্য। একারণ এই বংশ ষাট কাঠা জমি নিষ্কর ভোগ ক'রে থাকে। কিন্তু সমস্তই অস্তাচলে যাচ্ছে, উচ্ছন্নে যায়, বুড়ো বাঁদর অভিরামের কাল থেকেই এই বংশে আর ভক্তি নাই। এখন আর আগের মতো নরমাংস দেবার নিয়ম নেই—কলিকালে সবই সম্ভব—মা কয়েক ফোঁটা রক্ত পেলেই খুশি। অভিরামের ভাইপো মনোহর এমনিই নষ্ট দুষ্ট নচ্ছার বজ্জাৎ যে তাকে ডেকে ডেকে মায়ের পুজোয় পাওয়া যায় না—আরে বাপু, মায়ের তিন বিঘে জমি খাচ্ছিস্—মা-কে দুফোঁটা রক্ত দিবিনে? কলিকালে সবই সম্ভব—কপালে সিঁদুর লেপা ভুঁড়িঅলা প্রৌঢ়ের দল সমস্বরে আক্ষেপ করে। জটিল শাখা-প্রশাখাময়, বিপুল উপকথাবহুল অভিরাম দু-হাঁটুর মধ্যে আপন অশক্ত ঘাড় গুঁজে নির্বাক—শুধু মনোহর চকিত, আতঙ্কিত—কারণ এই স্থল আবদ্ধ, চারিদিকেই প্রাচীর—মায়ের কথা বলা যায় না, তবে তাঁর মনে দয়ামায়া খুব নেই, বিশেষ মায়ের মহিমাপ্রচারী বাবু ভাইদের দল আসলেই নর-খাদক। এরা মাংস রান্না ক'রে খায় না। ঐ কাকা অভিরামই একমাত্র বটবৃক্ষ।

এইকালে প্রদীপ নিবে যেতে থাকে, তৎহেতু অন্ধকার ফুর্তিবাজ বিড়েলের মতো চারিদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে ঘরে এসে পড়ে—মূর্তির বেদীটি শুধু আলোকিত—কালো শিলায় তৈরি মূর্তিটি নিজ নাক মুখ চোখ এবং ঘাড়ের পাশ দিয়ে ক্রোধ ও পৈশাচিকতার বাষ্প উদ্গীরণ করতে থাকে। হয়তো এই স্থলেই প্রকৃত পাষাণখণ্ডের সঙ্গে এই মূর্তির পার্থক্য

—পাষাণও কখনো কখনো গলে। বিশাল ঘরটির ভিতরের রং সম্পূর্ণত ছাই ছাই হয়ে এঁলে প্রতিটি মানুষই আপন আপন অবয়ব হারিয়ে ছায়ামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এখন কোনো গান নেই।

জ্যৈষ্ঠের আকাশে কোনোরকমের ছায়া নেই।

সেখানে কোনো বৃক্ষও নেই।

লাঙল, গরু, জোয়াল, মাংসপেশি, নারী, স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের জন্যে কোনো মাটি নেই।

পুনরপি কোনো গান নেই।

মনোহর ঘাড় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। বাজনদারের দলটি পরস্পর ঠেলাঠেলি শুরু করেছিল—বৃদ্ধ মহিষের মতো ঘাঁউ ঘাঁউ শব্দে কেউ কেশেছিল। ধূপের ধোঁয়া প্রবল ছিল।

মনোহর, এগিয়ে আয়—পুরুত ঠাকুরের আত্মবিশ্বাস এখন বড়োই সুস্থির—মাদক রস সম্ভবত জমে এসেছে, কণ্ঠে প্রবলতা ধ্বনিত হয়। কি হতে পারে—কি হবে এই ভেবে মনোহর পায়ে পায়ে এগোয়। আঃ, ঘাড়টো শিরশির করচে গ'—অক্তে কেঁচো যেচে যেন। মনোহর এলোমেলো, পুরুত ঠাকুরের কাছে আর পোঁছুতে পারে না—ঐ দূরত্ব জ্যামিতিক, বৃত্তাকার—কেউই দূরে নয়, কারো কাছেই যাওয়া যায় না—শেষে ব্যক্তিটি সদর্পে এগিয়ে এসে মনোহরের ঘাড়ে হাত দিয়ে হিড়হিড় টেনে মূর্তির সামনে বেদীর নিচে গিয়ে ব্যাটা প্রণাম কর, এই বলে মুঠোভর্তি সিঁদুর মনোহরের কপালে লেপন করে। অতঃপর গম্ভীর শ্লোকসমূহ উচ্চারিত হয়—আমরা এই ব্যক্তিটিকে, এই অন্ত্যজ অস্পৃশ্যটিকে বলিদান করি, উহার রক্তে মা, জননী, তোমার তৃষ্ণা মিটুক—হায়, পূর্বেকার দিন আর নেই, এখন সবই প্রহসন—এইরূপ ভণিতাপর্বের পর অতিদ্রুত পুরোহিত মনোহরের বৃহৎ উস্কোখুস্কো জটিল চুলভর্তি মাথাটিকে পার্শ্বেই স্থাপিত যূপকাষ্ঠে ঢুকিয়ে খিল এঁটে দেয়। তার হাঁটু দুটি মাটিতে প্রোথিত হয় —মেঝে কঠিন পাষাণময়, আলোর রেখাটি তেরছা, বাজনদারের দল এখনো স্তব্ধ ; তার কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে যায়, শিরদাঁড়ায় হিম রক্তস্রোত বয়, এখন সে সম্পূর্ণ মাটিতে ডুবে যাবে। এইরূপে সময় কেটে যেতে থাকলে উক্ত ভীমদর্শন পুরোহিত মহোদয় বিশাল খাঁড়াটি হাতে তুলে নেয়। সেটিও সিন্দুররঞ্জিত, অধিকতর পিশাচ স্বভাবের—পুরুত ঠাকুরের হাতে পড়ে সেটি এতই ব্যাদিতবদন যে তার আলজিহ্বা পর্যন্ত দেখা যায়। গায়ক

মনোহরের সবকিছুই গুলিয়ে যায়—তার দৃষ্টি ঘরের মেঝেয় স্থির নিবদ্ধ, হাঁটুতে প্রবল যন্ত্রণা—ময়লা ধুতিটি সরে গেছে, কিন্তু অতদূর হাত পৌঁছায়না—এই কালে প্রবল শব্দে কাড়া-নাকাড়া ঢাক-ঢোল-কাঁসি বেজে ওঠে, দেয়ালসমূহ কাঁপে, প্রদীপ শিখাটি হিস হিস নেচে ওঠে, বাইরে শুকনো সাইক্লোন—ভিতরে হাত ও হাতের অংশ, চোখের কোণ, পায়ের টুকরো, উলঙ্গ উত্তাল পশ্চাদ্দেশ—কি প্রাগৈতিহাসিক রেখাসমূহ, আলোয় খুবলে খাওয়া ছায়া—একটি কুচকুচে কালো কেউটে গায়ক মনোহরের ঘাড়ের ভিতর দিয়ে সাঁৎ ক'রে শির দাঁড়া বেয়ে চলে যায়।

মা, মা, মা উন্মত্ত চিৎকারের সঙ্গে খাঁড়াটি ধীরে ধীরে নামবে—সেটি সামান্য সময় মনোহরের ঘাড়ে থেকে অল্পকিছু রক্ত সংগ্রহ ক'রে আবার উঠে যাবে—মনোহর তখন মুক্ত হবে। কিন্তু তৎকালেই প্রবল কোলাহলে এইকথা গ্রামপথে প্রচারিত হয়, ঘন্টাবাবু, সাধের ঘন্টারাম নিহত হয়েছেন—হন্তারকদের জানা যায় নি, আহা, কারা তাকে পিটিয়ে নিধন করেছে—তবে সকলই বোঝা যায়, যাবেই। উপস্থিত বাবুদের চোখে ছলাং ছলাৎ শব্দে রক্ত আসে—পুরোহিতের হাতের খাঁড়া মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়—মনোহরের জানু হতে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বমান ক্ষতটিতে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা চিরে কেটে বসে যায়। খড়গ ধীরে ধীরেই নামে। তেঁতুলে বাগদীদের দলটি আশ্চর্যভাবেই উপস্থিত। ঠাকুর মশাই স্পষ্ট দেখে। মনোহর বারকয়েক হুমড়ি খেয়ে দাঁড়াতে পারে।

অতি প্রত্যুষে বাতাস জটিল আবহসংগীতের ন্যায় ঘুর ঘুর, স্থানে স্থানে বিদ্যমান—এতে শুকনা পাতার মর্মর মিশ্রিত ছিল, ফ্যাকাশে আলো পড়েছিল, আকাশে কোনো একরূপ নিশ্চিন্ততা ছিল—এরূপ সময়ে কোনো একটি শুকর উৎকট চিৎকার করছিল, সেটিকে পিটিয়ে পিটিয়ে বধ করা হচ্ছিল। এই দৃশ্যে আদৌ করুণার উদ্রেক হয় না—বরং হত্যাকর্মে হাত লাগিয়ে অতিদ্রুত কর্মসমাধার বাসনা জাগে। পশুটির চারটে পা একত্রে বাঁধা—তাকে চিৎ ক'রে শুইয়ে আকাশ দেখানো হয়। বলিষ্ঠ ডোমটি একাদিক্রমে লাঠি চালায়—তার কপালে ঘাম, দেহে আর বল নেই—সে মধ্যে মধ্যে শুকরের মুখে মুখ রেখে জড়িত উচ্চকণ্ঠে বুকফাটা গান গায়—উরে, দেকে লে জনমের মতো, ইবার তু বিদ্যাশ জাবি গ। শুকরটি এই গানে চুপ—পরক্ষণেই লাঠি চললে আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার জমায়।

এই শূকর দীর্ঘ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত খুন হতে থাকবে—তাকে মোক্ষম আঘাত কেউ করে না, সে বিনা বাধায় চতুষ্পার্শ্বে নরক রটাতে থাকে। তার চিৎকার গাঁক গাঁক, কটু, অশ্লীল ; পাখিগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে যায়। চিৎকার খোলামাঠে ছড়ায়। চারিপাশের প্রান্তরসমূহে জনগণ বিন্দু বিন্দু, কালো কালো ফুট্‌কির মতো—বিশাল এলাকা জুড়ে জীবনের খেলা জমেছে। দিকে দিকে গ্রামসমূহ খালি, সেই সব গ্রাম আপন আপন প্রান্তরে মানুষজন বমি ক'রে দেয়। এরা বন্যার মতো মেলার দিকে ধেয়ে আসে! কিভাবে তেপান্তর পার হয় জনগণ—এইসব রুক্ষ চাষী—তাদের লেংটি তেলচিটে লাল ধূলি মিশে কিম্ভূত—তাদের কালো শরীরে সূর্য ; তাদের মাথায় মুখে গামছা জড়ানো, পদে পদে শূন্যতা মাপে, তারা খোলামাঠের নাড়ার দিকে অন্যমনস্কে চায়—এই ভয়ংকর শূন্যতার ওপারে কোথায় পৌষমাস? কিসের মদ্য এখন তারা পান করবে? ইতস্তত জনপদসমূহের যত্রতত্র নবনির্মিত মৃতশালা—শৃগাল জাতি নধরকান্তি হয়ে উঠেছে। বৃক্ষগুলিতে শীর্ণ প্রশাখার মতো ঝুলন্ত মরদেহ, ঝোপঝাড়ে মৃত—পুকুরে মৃত, সর্বত্র তারা ছড়ানো। মৃতেরা বড়ো কঠিন নিষ্ঠুর, ইয়ার্কি-প্রিয়, জীবিতের দয়ামায়া রক্তমাংস কোথায় পাবে—এজন্যে অন্ধকারে মিশে, শেয়ালের চিৎকার, পেঁচার ডাক, কুকুরের কান্নায় মিশে লোকালয় শ্মশান ক'রে তোলে। অতএব জীবিতেরা সবাই দানোয় পাওয়া—তাদের কিছু বলা বৃথা—তাদের উদরে একটি ক'রে তীক্ষ্ণসূচিমুখ ছোরা বিঁধে আছে, তারা চোখে কিছু দেখে না। এই সব ধূ ধূ মাঠ পিছনে ফেলে অর্থাৎ ধুলোভর্তি নেতি পিছনে রেখে তারা পিলপিল মেলার দিকে আসে। পথগুলি শাদা—প্রকৃতিতে কেঁচোর মতো ঘিনঘিনে, এঁকে বেঁকে, বুকে হেঁটে চারিপাশ হতে বিশুষ্ক বিশাল দিঘিটির সুউচ্চ পাড়গুলিতে মেশে। জনগণ এইখানে একত্রিত হয়ে মেলার দিকে যায়।

অবশ্য মেলাস্থল ভয়ঙ্কর জমজমাট। গ্রামলগ্ন দ্বিতীয় দিঘিটিতে জল তোলপাড়—বাঁধাঘাট কাদায় ছরকুটে আছে, মেয়েরা শাড়িতে জল বয়ে গ্রামপথ কাদিয়ে দেয়। বলবান গেরস্থ পাড় থেকেই হাতের পাঁঠা জলে ছোঁড়ে, তাদের চোখের কোণে রক্ত জমে, তারা আজ মা ছাড়া আপন মা-ও চেনে না, তাদের জায়ারা মাগীমাত্র, পুত্রকন্যা শুয়োরের ছানা, এইসব গৃহস্থ মায়ের বলি পাঁঠা এনেছে সঙ্গে—সেগুলি আপন মনে ভেবিয়ে যায়, তবু

তির তির ক'রে সঙ্গে আসে, ছাপাৎ শব্দে জলে পড়ে একবারমাত্র অবাক বিব্রত ভ্যা শব্দে খাবি খায়—কাছি টেনে পাড়ে তুললে বাঁচবে বলে গা ঝাড়ে, শুকনো পাতাটি মুখে নেয়। তবে তখুনি পটাপট শব্দে পাঁঠার সামনের ঠ্যাঙদুটি ভেঙে পিঠের উপর উঠে যায়, যাগ্‌ বলি হয়ে গালো—ভেবে গেরস্থ বলির দিকে চায়—তার চোখের কোণের রক্ত সমস্ত চোঁখে ছড়িয়ে যায়, হারামজাদা কামার, বলির মুণ্ডু তুই পাবি বলে পাঁঠার মাঝখান কাটবি নাকি—আঃ? আর এট্টু হলে যে সামনের ঠেং মুণ্ডুর সাথে চলে যেতো।

যেতো তো কি করবো মশায়—কোপ এ্যাট্টা মেরেছি—কোতা মেরেছি জানি না—গ্যাঁজাও খেয়েচি, মদও খেয়েচি। না পোষায় অন্য কামার দ্যাখেন মশয়।

বলি হয়ে গালো—এখন কামারের ইয়ে ধুয়ে জল খাব?

মুণ্ডুটা রেখে বলি নে যান।

এইভাবে এইস্থান কর্দমাক্ত। রক্তে জলে ও ছাগের পেচ্ছাবে। বড়ো অসহ্য দুর্গন্ধ এইস্থানে মিশ্রিত। কাঁচা রক্ত মাংস চর্বি, মানুষের ঘাম, মাঠের শুকনা মিষ্টি ও তেলে-ভাজা—এসব গন্ধ একত্র মিশ্রিত। সিংহের মতো ঘাড়ে লোমঅলা বোকা পাঁঠাগুলির উপস্থিতির তীব্রতা দশদিক ভেস্তে দেয়—যদিও দ্রুত তারা লোপ পায়। এদের ব্যাপারটি সহজ নয়, গেরস্থ বোকাগুলির কাছে হার মানে, ভুলিয়ে ভালিয়ে জলে নিয়ে যেতে হয়, পাছায় লাথি দিলে তারা ব ব শব্দে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। এদের জন্যই যত্রতত্র হাড়িকাঠ পাতা—অন্যভাবে তাদের কাবু করা সম্ভব হয় না। মা মা শব্দে তুমুল রোল ওঠে—কি সাংঘাতিক কলরোল—পাঁঠাঘাড়ে উগ্রক্ষত্রিয়ের পিঠ বেঁকে যায়—সেই পিঠ জুড়ে রক্ত।

সমস্ত স্থান চর্বির গন্ধে ভরে যায়। অতএব অতিশয় দাহ্য—চর্বি কাঁচাও পোড়ে, তার জল পটপট শব্দে উবে যায়। একথাও অবশ্য যথার্থ যে সূর্যের গোলাটি মন্ত্রবলেই যেন আকাশের মাথায় উঠে এসেছে-মরণরত শুকুর তাকে আহ্বান জানায়, সে প্রত্যুষের স্নিগ্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে চোখ রাঙিয়ে বেরিয়ে আসে—মুহূর্তেই হাওয়া অদৃশ্য উজ্জ্বলন্ত তামার পাতে পরিণত হয়—পাখিগুলি ভেগেছে, আর উপায় কি? এই দেশ এখন খুবই দাহ্য—পাহাড়ের মতো সুউচ্চ দীর্ঘ পাড়গুলি নির্ধূম অগ্নিগিরি, আপনকারদের নিষ্ঠুরতার প্রচণ্ড ভার নিয়ে ছড়িয়ে আছে, তাদের গায়ে সামান্য সামান্য কাঁটাগাছ রোদে ঝলসায়, তামাটে ঘাস কেটে কেটে পথগুলি পর্যন্ত

অল্প এগিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—এইসব বিভিন্ন পথ দিয়ে আরও দাহ্য মানুষজন নীরবে আসে।

বহুবিধ কারণে মেলাস্থল খুবই রগরগে। জনসমাগম নিশ্চিতই ভীতিকর—চোঙা ফুঁকে নানারূপ চেতাবনী দেওয়া হয়—শিশুর নিখোঁজ সংবাদ, মেলা কমিটির বহুবিধ আবেদন ও সাবধানবাণী গগনবিদারী কণ্ঠে প্রচারিত হয়—আকাশের উন্মত্ত নাগরদোলাটিও দেখা যায়, মড়ার মাথার খুলি আঁকা জাদুর তাঁবু—সংক্ষিপ্ত চিড়িয়াখানা—এই মেলাস্থল কত দ্রুতইনা জমে ওঠে। এইখানে কিছু ঘটে বা—কারণ সমস্ত কিছুই বিচিত্রভাবে অবাস্তব—জাদুকরের কিম্ভূত পোশাক—উক্ত অবাস্তব প্রাণীটির চুন দিয়ে আঁকা চোখ, সে তার শীর্ণ হাত শূন্যে দোলায়। এখন দুপুরের দিকে সার্কাসের তাঁবু গোটানো—রূপকথার ঘোড়াটি যেটি তারের উপর দিয়ে যায়, আকাশে অদৃশ্য হয় সেই ঘোড়া, তার শিয়ালের মতো রঙ, পিছনের একটি পা খোঁড়া—সেটি এখন ঘাসের নামে পোড়ামাটি চিবিয়ে খায়—যে ভয়ংকর শ্বাপদ বুক ফুলিয়ে আকাশ ফাটিয়ে গর্জন করে সেটি এখন আপন খাঁচার মধ্যে অসুস্থ বেড়ালবৎ ঘুমোয়, তার চোখে পিচুটি ও অবসাদ—এই সবকিছু ঝকঝকে শাদা রোদে নিদারুণ অবাস্তব। জনগণ শুধুই মেলার পথ পরিক্রমণ করে—গোলকধাঁধায় ছুঁচোর মতো—ঘুরে ঘুরে তাদের হাঁটু ফুলে যায়— চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। এখানে জলই বা কোথায়—দোকানদারগণ নিজ নিজ দোকানে বসে ঢোলে—আম্র কলাদি পচে যায়, ভুঁড়েল ময়রাগুলি কি দোব বাবু এই বলে হাসিটি মুখে সেঁটে রেখে দেয়। শুধু মাছিদেরই আনন্দ—ময়রাদের বাহুতে ব্যথা ধরে যায়, তারা রাগবশত মাছিদের খচ্চর বলে থাকে।

কিন্তু রাজহস্তী কোথায়? আপন স্থূলোদর, থামসদৃশ পদচতুষ্টয়—সে যেন চলন্ত পর্বত, দিগন্তে দেখা দিয়েছিল, তার গলার ঘন্টার কি বিষণ্ণ স্বর, রোদ-জ্বলা প্রান্তরে অন্যমনস্কে দুঃখ ছড়াতে ছড়াতে যায়—এমনিই তাত যে সামান্য দূরে ধাঁধাঁ ঠেকে, মেঠো ডোবাসমূহে জল নেই, শাপলাগুলি বিবর্ণ, প্রান্তর দিনে-দুপুরে দিপদিপ আওয়াজ করে—এই অবস্থায় রাজহস্তী কি বিদীর্ণ হয়েছে? মানুষেরা ভাগাড়েও হাড় খোঁজে—হস্তী কি ছরকুটে গেল, তার অস্থিসমূহ কি রৌদ্রে শুকোয়? যার কালো শরীর ধুলোটে হল, পেছনের কামানের মতো ঠ্যাং ঘেষটে ঘেষটে যায়—চতুর্দিকের প্রবল

তরাসে, অগ্ন্যুৎপাতে সেই রাজহস্তী এখন কোথায়! দিঘির ঈশেন কোণে বিরাট বটের নিচে কটা রঙের মেঘ নিশ্চল ছিল, ঐ মেঘের শুঁড় নড়ে—হাতি আপন মনে সূর্য ঢাকা দিয়ে রোদের মাথায় ছায়া চেপে ধরে। কাজেই জনগণ ঘুরে ঘুরে এখানে আসে—দেখে রাজহস্তীর পাছা বসে গেছে, এক ঠ্যাং মেলে ধরা—দুটি বটের পাতার লোভে মাটি থেকে তামার পয়সা তোলে, একটি পচা কলা পেলে কুক দেয়। হাতির সেই নবজলধরকান্তি যেন চিত্তির খেয়ে গেছে—সে কখনো কখনো ক্ষুদে চোখে পাগলের মতো চায়। কিন্তু মানুষেরা আর কোথায় বা যাবে—ঘুরে ঘুরে এইখানেই আসে। এই স্থলে বসে সুবিশাল প্রান্তর দেখে, গন্‌গনে আকাশ দেখতে পায়—শরীরে আগুন ধরানো নেই এই স্থানেই স্পষ্ট হয়। তবে বটের ছায়ায় মাথার তালুটি ঠাণ্ডা—দিঘির কালো জলের দৃশ্যে চোখ নরম হয়ে আসে—এই স্থান থেকে নিচু গ্রামের রাস্তার মেলার ধুমধাম, ঠকঠক, প্রচণ্ড চেল্লানি অস্পষ্ট সাগর গর্জনের মতো মিঠে লাগে—অতএব মানুষজন ঘুরে ফিরে এখানে আসে।

মন্তাজ তার গামছাটি অপসারিত করে মুখ থেকে। তার দাড়িগুলি খ্যাংরা কাঠির মতো—মুখমণ্ডল বড়োই ঝাঁঝালো, তার ক্ষুদ্র চোখ আর কিছুতেই শান্ত হয় না—কিন্তু এই চোখ ক্রমান্বয়ে হাসে—হাসি দেখে মনোহর বলে, জানিনা, আমরা কি ক'রে বলব গ—আঁ?

উ কথাটো আর আমাকে বলিস না মনা—মেলাটো ভেঙেগ গেলচে পেরায়, পাঁচগড়ের পূব পাড়ে লোকে লোকে ছয়লাপ—এক শালো তেঁতুলে বাগদী দেখলোম না ক্যানে?

তেঁতুলে বাগদীরা যাবে কেনে গঁ—বাবুদের কাছে বাঁধা দিছি লিকিন মোরা?

অয়—মনা, তুকে ঠিক বিলুই বিলুই লাগছে—ইঁদুর খেয়ে বিলুই গোঁফ চাটে, লয়?

বাগদীরা সব ঘুমুইচে, না—সারারাত মদ খেঁয়েচে যি।

দুপরটা পেরুইতে দাও বাবাজী, থানা থেকে পল্টন এলো বলে—ঘুম বার করবে।

পুলিশ এসবে লিকিন?

না তা ক্যানে আসবে, বাবুরা বসে বসে এঁটে চাপড়াবে, লয়?

আমরা ইসব জানিনা, কিচুই জানিনা।

মন্তাজ অকস্মাৎ অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়, একারণ তার মাথার টিকির

কিছু কিছু চুল খাড়া হয়ে ওঠে—এইদিকে মরুভূমির মতো প্রান্তর—বায়ু শুষ্ক, দম বন্ধ হয়ে যায়—ওদিকে ক্রমাগত সারি সারি গোর দৃষ্ট হয়, সে অতিষ্ঠ অস্থির, সে এছোল পেছোল পছন্দ করে না, বড্ডা স্যায়না হ'য়েচো। লিজের চোখে লাশ দেখে এ্যালোম—ঢ্যামনাটোকে পিটিয়ে লিকেশ করেছে। তে'তুলে বাগদীদের আমি চিনি না লয়?

মনোহর গোড়ালির ক্ষতটিতে হাত বুলোয়—গতরাতের পুজো কেমন লণ্ডভণ্ড হোল, পুরুত মশাই কে'পেছিল, কি জানি যদিবা হাত ফসকে খাঁড়া পড়তো মনোহরের ঘাড়ে—যদিবা ঠাকুরের হাতের খাঁড়া ছিনিয়ে নিয়ে বাবুদের কেউ ঝেড়ে বসাতো কোপ?

আমাদের পরাণের জ্বালায় নিজেরাই বাঁচনা। উসব ক্যা খুন হোল না হোল আমরা জানিনা।

মন্তাজ ঘাড়টি বাঁকিয়ে প্রশ্ন করে, তুদের আবার জ্বালা কিরে? বেশতো তুদের মায়ের পেসাদ মেশাদ খেচিস। হাল-লাঙল করচিস কুদুম কুদুম, খেটে খেটে তু শালোদের পরনের কাপড় মাথায় উঠেছে, বাবুদের ঘরে ধান জোমা হচে দিনকে দিন—আচিস বেশ তুরা।

মনোহরের চক্ষুদ্বয় অঙ্গারবৎ, সে আপনার কথাদ্বারা বাতাসকে কয়েকবার তীব্র কশাঘাত করে, উসব বুলো না বুলছি—মা আছে আপনার সিংহাসনে, ই শালোর বাবুরা মা লিয়ে কতো ধাষ্টামো করে গ'?

তে'তুলে বাগদীরা সব ঘুমুইচে, লয়? আবে, ইকি গান বানাইচিস লিকিন আমার কাচে? মন্তাজের হাসিতে কিয়ৎপরিমাণ মাটি চিড় খায়—তে'তুলেদের যে বিরাট দলটি রাজহস্তীর দিকে আসছিল, অঙ্গুলী নির্দেশে সেদিকে দেখিয়ে মন্তাজ পুনরপি বলে, তে'তুলে বাগদীরা সব ঘুমুইচে, লয়?

মাটি যেন টগবগিয়ে পায়ের নিচে ফোটে—শুষ্ক বৃক্ষ শাখাটি পড়েই বা জ্বলে যায়—কোনোদিকে অন্তরাল নেই—শেযে হস্তীর আড়ালেই মানুষেরা যায়, তথায় অতি উষ্ণ ধোঁয়া—এই অকুস্থলে অভিরাম—তার মাথাটি কোনোরূপে ঘাড়ে আছে, তার চক্ষে অমেয় অমানিশা বা, সে প্রক্ষিপ্ত—এই আধুনিক বাগদী দলে সে আদিম সংস্কার, কোনো কথা না বলে শুধুই শিরশ্চালনা করে, তাকে ঘিরে তে'তুলে বাগদীর দলটি সারি সারি দণ্ডায়মান, প্রস্তরমূর্তি এইরূপ, এদের মুখ শুকনা, চোখ রুষ্ট রুঠা—এরা নির্বাক।

খুনটো আমরাই করেছি—এই কথা মনোহর ভেবেচিন্তে বলে। আপন

জাতভাইদের মুখের দিকে একবার চোখদুটি বুলিয়ে সে পুনরপি বলে, বড়ো জ্বালায় জ্বলছি মোরা, আই গ', ই আবার কি শুদোও চাচা, পেটের মধ্যে যন্তনার কি ব্যাপার বলো—একথায় চতুর্দিক হা হা হু হু শব্দে তীব্র বাতাস প্রেরণ করে—ঢেউয়ের পর ঢেউ যেমন—ক্যা জানে মোরা ইর পর কি করব, আঃ গ'—মোদের পেটের মধ্যে জ্বালা, ঢ্যামনা বাবুরা মোদের উপোষী মেয়েমানুষ চাটে—খিদেয় মানুষ ফাঁসি যায়—লিজেরা লিজেরা লটকায় গাছের ডালে—সোনার পুত শুকিয়ে মরে বটে—এই কথায় মন্তাজ বলে, আঃ মনা, মানুষ না মেরে মানুষ বাঁচে লিকিন? মানুষ কুকুর হলছে—সি মানুষ মারলে কুকুর মরে।

ঐস্থলে সত্বর মনুষ্যপ্রাচীর তৈরি হয়েছিল—চতুর্দিক থেকে মানুষসকল তখনো আসছিল, এদের আঙুলের ফাঁকে শুকনা ঘাম জমে আছে, লালধুলো এদের বেষ্টন করেছে—তারা কি দুর্বোধ্য টানে মেলায় আসে—কিসব কর্মহীন ধান্দায়? এদের পটভূমিকায় শূকরের চিৎকার—সূর্য মধ্য গগনে যেন উড়ে এসেছে। ধূলি উত্তাপ মনুষ্যচিৎকার পরস্পরে মেশে—সেইকালে প্রবল, প্রবলতর, নিষ্ঠুরতম অসংখ্য ঢাক বেজে ওঠে।

মেলাস্থলের মধ্যে উচ্চভূমিতে বৃহৎ যূপকাষ্ঠ স্থাপিত। সেটি চোখ ধাঁধানো শাদা আলোয় দাঁড়িয়ে, অগ্রভাগ দ্বিশাখাবিভক্ত ত্রিশূলবৎ, মোটা খিলটি পাশেই পড়ে আছে—এটি এতই উচ্চে অবস্থিত যে সেখানে বৃহত্তম অজেরও ঘাড় পৌঁছায় না—বস্তুত এই যূপকাষ্ঠ ছাগজাতির জন্যে উত্তোলিত হয় নি—জননীর সর্বশেষ খাদ্য একটি বৃহদাকার মহিষ। সেই ভোজনপর্ব এইভাবে স্থিরীকৃত যে সূর্য মধ্য গগনে যাবে, ছায়াসকল হ্রস্বতম হবে—সূর্য মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে। মধ্য রজনীর ন্যায় গভীর সেই কাল সমাগত—কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠেছে। যূপকাষ্ঠ ফাঁকায় আকাশের দিকে চেয়ে আছে, সেটি ছায়াহীন, ভয়াবহরূপে একাকী, কাছাকাছি কেউ নেই—দশ গজ দূরত্বে মানুষ সকল বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান। এইসব মানুষ পুষ্ট পুরুষ্টু, আদুল গা, ঘর্মে সিক্ত বসন, কপালের সিঁদুর গলে গলে মুখ বেয়ে পড়ে—এরাই পূজার্থী, সকলের হাতেই ছোটোখাটো খাড়া।

মহিষটিকে অকস্মাৎ দেখা যায়—মানুষের বৃত্ত ভেঙে ভিতরে আসে—জীবটি ইতিমধ্যেই নির্জীব, জননীর নজর লেগেছে,—মহিষ সশব্দে মূত্রত্যাগ করে, যূপকাষ্ঠ কেমন বা ভেসে যায়। কিন্তু উক্ত প্রাণীর পিছনের পায়ে আঁট নেই, বিশেষ, পিছনের বাম ঠ্যাং তুলতে গেলেই থরথরিয়ে কাঁপে, পশ্চাদ্দেশ গোময়লিপ্ত, আরো, মহিষের ঘাড়ে মোটা শিরা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়—

এইস্থলে ক্রমাগত গব্যঘৃত মর্দন করা হয়েছে কারণ এককোপে ঘাড় নামানো চাই—অন্যথায় মায়ের অভিশাপে সমস্তই ছারেখারে যাবে। কোনো অদৃশ্য ইংগিতে ঢাকঢোল থামে—ঐ স্থানে শব্দহীনতাও স্থির, পূজার্থীসকল আধ্যাত্মিকতায় প্রস্তরমূর্তিবৎ, জিঘাংসা ও শয়তানি মুখমণ্ডলের রেখাসমূহে সযত্নে রচিত হয়েছে। নিদ্রাবেশে ঢুল ঢুল রুগ্ন মানুষটি এতক্ষণে মঞ্চে আবির্ভূত হয়। এই ব্যক্তির হস্তে বিশাল খড়্গ সে যেন ভারবহনে অক্ষম, তার চক্ষুদ্বয় বুঁজে আসে, তার শুকনো হিংগুলবর্ণ, তার কোমরটি এরূপ ল্যাকপ্যাক যেনবা হঠাৎই মট শব্দে ভেঙে পড়বে। সে একটি পাশে হাতের খড়্গে আপন দেহভার অংশত রক্ষা ক'রে দাঁড়ালে বলবান কিছু কিছু গেরস্থ-বাবু মহিষটিকে যূপকাষ্ঠে জোতে—তার সামনের পা সামান্য মাটিছাড়া হয়, একারণ ঐ পূজাস্থলে মহিষটি যেন শূন্যে লটকানো আছে এরূপ প্রতীয়মান হয়। মহিষের মুণ্ডু ধরে এমনি টান পড়ে যে তার ঘাড় লম্বা একগোছা দড়ির মতো—শুধুই রবারের মতো বাড়ে। এইরূপ সংকটের কালে মানুষ্যসকল রক্তমুখী—ভেদবমি রক্ত—সূর্য সংক্ষিপ্ত দূরত্বে—জ্বলে জ্বলে যায় ক্কড়াক্বড় ক্বড়াক্বড় শব্দে নারকীয় ঢাক ইত্যাদি বাজে—মা মা ধ্বনিতে দিগন্তসকল প্রকম্পিত হয়েছিল—বিশাল খড়্গটি মন্ত্রবলেই উঠে অনিবার্য গতিতে নিচে নামে।

তৎকালে তন্দণ্ডে তন্মুহূর্তে পোড়া চিম্‌সে গরম বাতাসের হলকা আসে—কোনোরূপ সাবধানতার পূর্বেই ; এই মেলাস্থলে অসংখ্য অগণ্য মনুষ্যসমূহের নিঃশ্বাস এক কালেই বন্ধ হয়—সূর্যের আলোর অত্যাচারে ধূমই দেখা যায়, অগ্নি অদৃশ্য—তেঁতুলে বাগদীদের পাড়া থেকে স্ত্রীলোক বৃদ্ধ শিশুর বুক ফাটানো শির খোঁচানো আর্তনাদের বিকট চিৎকার শোনা যায়—চতুর্দিক হতে আগুন আগুন এইরূপ আহ্বানও ভাসে, তবুও অগ্নি অদৃশ্য—শিখাসমূহ সূর্যালোকে মিশেছে, শুধুই বাতাস কাঁপে, কিছু কিছু ধোঁয়া দৃষ্ট হয়—পোড়া ছাই উড়ে উড়ে আসে—ফট ফট শব্দে বাঁশ ফাটে।

অতএব অগ্ন্যুৎপাতের আর কোনো অপেক্ষা নেই। অগ্ন্যুৎপাৎ সম্পূর্ণ হতে থাকে। এই বিশাল ভূখণ্ড ভয়ঙ্কর দাহ্য ছিল ; নেলাখেপা রাজহস্তী আপনার বেঢপ পদচতুষ্টয় দিয়ে জরিপ ক'রে ক'রে এই সত্য জানে ; প্রান্তরের গর্তসমূহ হতে বাষ্প নির্গত হয়—ধানের নাড়া অকস্মাৎ দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে—এই হেতু বিকট শব্দ অগ্ন্যুৎপাতজনিত বিপর্যয়ে এত বড়ো অঞ্চল টুকরো টুকরো, খণ্ডে খণ্ডে আকাশে ছড়ায়, ধূমশিখা অগ্নিপিণ্ড ইত্যাদি চতুর্দিকেই যায় ; মেলা ভাঙে, ইতস্তত দোকানগুলি ধ্বসে যায়,

দ্রব্যাদি সবই বিক্ষিপ্ত, লণ্ডভণ্ড, জনগণ তীব্র চিৎকারে উন্মাদ, ওরা এই বাংলাদেশ, হৃদয় ফাটিয়ে দেয়, জ্বালিয়ে দেয়—বাবুরা মোদের পাড়ায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে গং—ভাইরা শোনো, শোনো—এই কথায় গান কই, উল্টে মনোহরের পায়ের ক্ষতে অপূর্ব বিস্মরণ, সিংহের হৃদয় এসে ঠাঁই নেয়। এছাড়া কর্তিত মহিষ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকে, মানুষ নেই, দেবীমূর্তি মুহুর্মুহু লাঞ্ছিত—আগুনের বাতাসে জাদুগৃহের কালো পর্দাগুলি পৎ পৎ, সার্কাসের ঘোড়াটি শূন্যে অবাস্তব দৌড় লাগায়, ইতিমধ্যে কোনো কোনো মানুষের চোখের ঝলকটিই দেখা দেয়, আয়, শালোরা, দাদ লি, আয় ভাই, জুলুমের লিকেশ দেখি—এই ধ্বনি অতি সূক্ষ্ম তরবারিবৎ সোঁৎ ক'রে মেলায় এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত ফুঁড়ে দেয়—মন্তাজ গামছাটি মুখ থেকে খুলে কোমরে বাঁধে।

মাহুতকে দূরে ছুঁড়ে আপন শিকল ছিঁড়ে রাজার হাতি পেট খালি ক'রে দম নিয়ে ঝাঁ ঝাঁ বৃংহিত দেয়।

বৃংহিতই সংগীত।

রাজহস্তী উদ্দাম নাচে।